হারবাল চিকিৎসার প্রশিক্ষণ
(চিকিৎসা পদ্ধতি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা)

হারবাল একটি অত্যন্ত উপকারী প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি যা অতি প্রাচীন কাল থেকেই এদেশের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ক্রমবিকাশভেদে এই শাস্ত্রটি হেকিমী, আয়ুর্বেদী, ইউনানী ইত্যাদি নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

অসংখ্য হেকিমী চিকিৎসকের নিরলস পরিশ্রমের সমষ্টিই হচ্ছে আজকের হরবাল চিকিৎসা শাস্ত্র। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হজরত দাউদ (আঃ) কে নবুওত দান করার তিন বছর পর আল্লাহতায়ালা লোকমান হেকিমকে হেকমত দান করেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর বর্ণনা মতে, নওবা নামক এক জনপদে জন্ম গ্রহণ করেন এই লোকমান হেকিম। প্রথম জীবনে তিনি সায়েম এর অধিবাসী এক ধনাঢ্য ব্যক্তির গোলাম ছিলেন। গোলামী জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, আল্লাহতায়ালার অসীম অনুগ্রহে তিনি শ্যাম দেশে এলেম ও হেকমত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে তার অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। শেষ জীবনে তিনি ফিলিস্তিন গমন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করে রমাল্যাতে সমাহিত হন।

কেন হারবাল চিকিৎসা পছন্দ করবেন ?

- এটি একটি সহজ ও সরল চিকিৎসা পদ্ধতি
- প্রাকৃতিক উপাদান, গাছ-গাছড়া, ফল-মুল তরি-তরকারী ইত্যাদি থেকে হারবাল ঔষধ তৈরী হয়।
- এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।
- এটি সহজলভ্য, দামে সস্তা ও নির্ভরযোগ্য

একজন হারবাল চিকিৎসকের কি কি গুন থাকা উচিত ?

১. সৎ ও পরিশ্রমী
২. সময়ানুর্বতী ও নিয়মানুবতী
৩. নম্র-ভদ্র, সদালাপী ও মিষ্টভাষী
৪. বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য, নির্লোভ ও আন্তরিক
৫. বিচক্ষণ ও দুরদর্শী

খাদ্য ও পুষ্টি

বেঁচে থাকার জন্য, কাজ করার জন্য এবং শরীরকে সুস্থ্য রাখার জন্য খাদ্য প্রয়োজন। গুনাগুন অনুসারে খাদ্যকে ৬ (ছয়) ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. আমিষ বা প্রটিন
২. শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট
৩. স্নেহ বা তৈল বা ফ্যাট
৪. লবন ও খনিজ পদার্থ (সল্ট এন্ড মিনারেল)
৫. পানি বা ওয়াটার
৬. খাদ্যপ্রান বা ভিটামিন

খাদ্য উপাদান গুলির উৎস ও কার্যকারীতা-

১. আমিষ বা প্রটিন

উৎস	কার্যকারীতা
মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল, ছোলা, সোয়াবিন ইত্যাদি তৈরী	১. শরীরের গঠন ও বৃদ্ধি ২. মাংসপেশী ও কোষ

২. শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

উৎস	কার্যকারীতা
চাউল, গম,যব, আটা, ময়দা, টিনি, গুড়, বার্লি, মিশ্রি, আলু, সুজি, সাগু ইত্যাদি	১. শরীরে শক্তি ও তাপ যোগায় ২. শরীরে গ্লুকোজ তৈরী করে ৩. কিছুটা মেদও তৈরী করে।

৩. স্নেহ বা তৈল বা ফ্যাট

উৎস	কার্যকারীতা
তেল, ঘি, বাদাম, মাখন, তৈল বীজ, মাংসের চর্বি, মাছ, দুধ, ডিম ইত্যাদি	১. শরীরে শক্তি ও তাপ যোগায় ২. শরীরে গ্লুকোজ তৈরী করে ৩. কিছুটা মেদও তৈরী করে।

৪. লবন ও খনিজ পদার্থ (সল্ট এন্ড মিনারেল)

উৎস	কার্যকারীতা
খাদ্যের সামুদ্রিক লবণ, খনিজ লবন, উদ্ভিদ ও প্রাণীজ লবন ইত্যাদি	১ খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি ২. রক্ত শোধন ও তৈরী ৩. হাড়, অস্থি, মজ্জা গঠন।

৫. পানি বা ওয়াটার

উৎস	কার্যকারীতা
খাদ্যরে সামুদ্রকি লবণ, খনজি লবন, উদ্ভদি ও প্রাণীজ লবন ইত্যাদি	১. খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি ২. রক্ত শোধন ও তরৈী ৩. হাড়, অস্থ,ি মজ্জা গঠন।

৬. খাদ্যপ্রান বা ভিটামিন

উৎস	কার্যকারীতা
শাক-সবজি, ফল-মুল, দুধ, ডিম, মাছ ইত্যাদি	১. রোগ প্রতিরোধ করা।

উৎস ও কার্যকারীতার বিবেচনায় ভিটামিন ৬ প্রকারঃ

১. ভিটামিন- এ
২. ভিটামিন- বি
৩. ভিটামিন- সি
৪. ভিটামিন- ডি
৫. ভিটামিন- ই
৬. ভিটামিন- কে

ভিটামিনের আরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নরূপঃ-

ভিটামিন	উৎস	অভাবে রোগ
ভিটামিন- এ	যে সকল ফল ও সবজি পাকলে হলুদ হয়। তাছাড়া, গাজর, টমাটো, ফুল ও বাঁধা কপি, লাল আলু, দুধ, ডিম, মাছের তেল	রাতকানা রোগ, চক্ষুরোগ, সুতিকা, উদারাময়, ঝিল্লি ক্ষয়
বি- ১ (থায়ামিন) বি- ২ (রিবোফ্লাভিন) বি- ৬ (পাইরিডক্সিন) বি-১২ (সায়ানোকোবালামিন) ও নিকোটিক এ্যাসিড	বিভিন্ন শাক-সবজি, ঈষ্ট, ঢেঁকিছাটা চাল, ছোলা, মটর, সয়াবিন, বাদাম, নারিকেল, ডিম, টমাটো ইত্যাদি	বেরিবেরি, পেলাগ্রা, স্নায়ুরোগ, রক্তশুণ্যতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে
ভিটামিন- সি	সকল টক ফল, পিয়াজ, লেবু, তরমুজ	হাড়, শিরা,দাঁত ঘাঁ শুকায় না
ভিটামিন- ডি	কডলিভার অয়েল, ঘি, তেল, ডিম, মাখন,ছানা	ঘাড় ক্ষয়, রিকেট, ক্ষীনতা
ভিটামিন- ই	কলা, নারিকেল, দুধ, ডিম, আটা,	গর্ভপাত, জরায়ু রোগ, পুরুষত্ব।
ভিটামিন- কে	ফল, সবজি, দুধ, ডিম	রক্ত জমাট।

আয়রণ, ক্যালশিয়াম, ফসফরাস ও আয়োডিন

আয়রণঃ

ভিটামিন বি-১২ এর ফলিক এসিড মিশ্রিত হয়ে শরীরে রক্ত উৎপাদন করে। রক্তে হেমোগ্লোবিনের পরিমান বাড়ায়। আয়রণের অভাবে শরীর রক্তশূণ্য ও দুর্বল হয়ে পড়ে। শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ির স্পন্দনের গতি কমে যায়। মাথা ব্যাথা, শরীর দুর্বল, ক্ষুধামন্দা, শ্বাস কষ্ট, চোখের চারপাশে কালিপড়া ও হলদে ভাব দেখা দেয়।

বিভিন্ন শাক-সবজি, ফলমুল ও খনিজ পদার্থে আয়রণ আছে। কাঁচা কলা, কচুশাক, কলাগাছের শাঁস এ প্রচুর আয়রণ পাওয়া যায়। তাছাড়া যে সকল সবজি ও ফল কাটার সময় প্রচুর পরিমানে কালো কষ বের হয় তাতেই আয়রণ আছে বুঝতে হবে।

ক্যালশিয়ামঃ

হাড়, দাঁত ও চুল কে মজবুত ও শক্তিশালী করার জন্য ক্যালশিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্যালশিয়ামের অভাবে ¯œায়ুতন্ত্র দুর্বল হয়ে যায়, স্মরন শক্তি ও যৌন শক্তি কমে যায়। লবন, আয়রণ, ফসফরাস, আয়োডিন ও ভিটামিনের সাথে মিশ্রিত হয়ে শরীরকে সবল করে তোলে এই ক্যালশিয়াম।

দুধ, ডিম, পনীর, সবুজ শাক ইত্যাদিতে কিছু ক্যালশিয়াম বিদ্যমান। মাছের কাঁটা ও মাংসের হাড়ের মধ্যে প্রচুর পরিমানে ক্যালশিয়াম পাওয়া যায়। এছাড়া, কিছু খনিজ ও প্রাকৃতিক ক্যালশিয়াম থেকেও পর্য্যাপ্ত ক্যালশিয়াম সংগ্রহ করা হয়।

ফসফরাসঃ

এটি ক্যলশিয়ামের কাজকে সহযোগীতা করে।

যেসব খাদ্যে ক্যালশিয়াম আছে তাতে ফসফরাসও আছে।

আয়োডিনঃ এর অভাবে গলগন্ড ও ঘ্যাঁগ রোগ হয়। সমভুমির শাক-সবজি ও খনিজ লবনে আয়োডিন থাকে।

সুষম খাদ্য বা ব্যালেন্সড় ডায়েট

ভাল খাবার মানেই মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, দামি ফল- পুষ্টি জ্ঞানের অভাবে অনেকের মধ্যে এমন ভুল ধারণা রয়েছে। সঠিক ধারণা হচ্ছে, এমন সব খাদ্য প্রতিদিনই নিরবাচন করতে হবে যে গুলোতে ৬ টি খাদ্য উপাদানই সুষমভাবে থাকে। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ্য মানুষের দৈনিক ২৫০০ থেকে ৩০০০ ক্যালরি মানের খাদ্য খাওয়া উচিত। নিচের তালিকার খাদ্য থেকে ৩০০০ ক্যালরি শাক্তি উৎপন্ন হতে পারেঃ-

দৈনিক আর্দশ খাদ্য তালিকা

খাদ্য	পরিমান
চাল, গম, আটা, ময়দা	৫০০-৭৫০ গ্রাম
ঘি, মাখন, পনির	৫০ গ্রাম
সয়াবিন তেল	৩০ গ্রাম
মাছ, মাংস, ডিম বা ছানা, সয়াবিন	১০০ গ্রাম
শাক-সবজি	২৫০ গ্রাম
ফলমুল	২৫-৩০ গ্রাম
চিনি বা গুড় বা মধু	২৫-৩৫ গ্রাম
ডাল	১২০-১২৫ গ্রাম
লবণ	১০ গ্রাম
পানি	যত বেশী সম্ভব

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যে ক্যালরি মান

খাদ্য	ক্যালরি	খাদ্য	ক্যালরি	খাদ্য	ক্যালরি
চাল	৩২৮	ডিম	১৭৫	আলু	৯৯
আটা	৩৫৩	ডালডা	৯০০	কাঁঠাল	১৮৪
সয়াবিন	৪৩৫	ছোলা	৩৩৫	আপেল	৫৬
রুই মাছ	১৬৮	মুশুরী	৩৪০	পেয়ারা	৬৬
মাংস	১৪৫	মি/আলু	১৩২		**হার-৬**

মানব দেহের পরিচয়

কোষ ও টিসু বা কলা

অসংখ্য ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জীবন্ত কোষ নিয়ে গঠিত হয়েছে মানব দেহ। প্রত্যেকটি কোষকেই বলে জীবকোষ। অনেকগুলি কোষ একত্রে মিলে তৈরী হয়েছে এক ধরনের টিসু বা কলা। এই টিসু বা কলা দিয়েই তৈরী হয়েছে পুরো দেহ। কলা প্রধানতঃ তিন ধরনের হয়ে থাকে:-

১. আবরণী কলা- এটি দেহের উপরিভাগ বা ত্বক

২. যোগ কলা- দেহের হাড়, জোড়া, রক্ত, মজ্জা ইত্যাদি

৩. মাংস পেশীর কলা- দেহের পুরো মাংস এ দিয়ে তৈরী

রক্ত

রক্তের কাজ

১. জীব কোষের সঞ্জীবনী প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করা

২. ফুসফুস থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের অক্সিজেন নিয়ে হৃৎপিন্ডকে দেয়া

৩. কারবন ডাই অক্সাইড ও পরিত্যাক্ত দ্রব্য বহন করে বের করা

৪. কিডনীতে গিয়ে ছাঁকনির কাজ করে অশুদ্ধ পদার্থ বের করা

৫. লিভারে খাদ্যের সারবস্তু জমা করা

৬. শরীওে তাপ, চর্বি ও পুষ্টি পরিবহন করা।

রক্তের উপাদান

১. রক্ত তৈরী হয় আয়রণ, ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম, কপার, আয়োডিন ইত্যাদি দিয়ে।

২. রক্তে ভাসমান শ্বেত কনিকা ও লোহিত কনিকা থাকে। শ্বেত কনিকা দেহকে বাইরের জীবানুর আক্রমন থেকে রক্ষা করে।

৩. লোহিত কনিকার জন্যই রক্ত লাল। এর হেমোগ্লোবিন কোষ ফুসফুসের সাথে অক্সিজেন ও কারবন ডাই অক্সাইড আদান -প্রদান।

রক্তের পরিমান

সাধারণতঃ কোন মানুষের ওজনের ১২ ভাগের ১ ভাগ রক্ত থাকে। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৮০-১০৯০ (পানিকে ১০০০ ধরে)। রক্তের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট। একটি সুস্থ্য স্বাভাবিক মানুষের দেহে ৪.৫-৫ লিটার রক্ত থাকা ভাল।

রক্তের পরিবহন প্রণালী

১. মুল কেন্দ্র হৃৎপিন্ড থেকে রক্ত বের হয়ে তা প্রধান ধমনী বা এয়ার্টা তে প্রবেশ করে। এরপর তা ধমনী বা আর্টারী তে প্রবেশ করে। তারপর এই রক্ত-

২. রক্তনালীর বিভিন্ন শাখা-উপশাখা, এমকি ক্ষুদ্র সরু উপ শাখা গুলিতেও পৌঁছে যায়। যেগুলোর নাম হচ্ছেড়- আর্টারিজ, আর্টেরিওলস, আর্টারি ক্যাপিলারিজ ইত্যাদি।

৩. কতগুলি সমান্তারাল নালী দিয়ে রক্ত শিরা ও সুক্ষè শিরা হয়ে তা মোটা শিরায় উপনিত হয় এবং পুনঃরায় হৃৎপিন্ডে ফিরে আসে। হৃৎপিন্ডের দিকে পরিবাহী নালী গুলির অনেক শাখা-উপশাখা আছে। যেমন:- ভেইনস, ভেনিউলস, ক্যাপিলারীজ ইত্যাদি।

৪. রক্ত যাওয়া ও ফিরে আসা এই দু'টি পরিবহন প্রণালীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বা অ্যানাসটোমোলিস। যেখানে সুক্ষèাতিসুক্ষè নালীগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকে তাকে ক্যাপিলারী বেড বলে।

৫. ধমনী বা আর্টারীর মধ্য দিয়ে দেহকে শক্তি, খাদ্যপুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। ধমনী ও তার শাখা-উপশাখা গুলির রং লাল বর্ণের হয়।

৬. অক্সিজেন শেষ হয়ে গেলে অশুদ্ধ রক্ত আবার হৃৎপিন্ডে ফিরে আসে শিরা, উপ-শিরা ও তা শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে। এগুলির রং কিছুটা নীলচে ধরনের লাল হয়।

মোট কথা, রক্ত দেহের জন্য প্রয়োজনী উপাদান গুলি নিয়ে সব সময়ই বিভিন্ন পথগুলি দিয়ে যাওয়া-আসা করে। রক্তকে পাম্প করার কাজ কওে হৃৎপিন্ড।

¯ায়ু ও ¯ায়ু তন্ত্র

¯ায়ু হচ্ছে তৈলাক্ত পদার্থে পূর্ণ এক ধরনের ফাঁকা নালী। এটি দেখতে সুক্ষè সাদা সুতার মত। ¯ায়ুর প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিস্ক। এর অসংখ্য শাখা প্রশাখা শরীরের সর্বত্র অনেকটা ইলেক্ট্রিক তারের মতই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এমনও কিছু শাখা প্রশাখা আছে যা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখাই যায় না। ¯ায়ুতন্ত্রে তিন ধরনের নার্ভস দেখা যায়। যথা:-

১. মোটর নার্ভসঃ যে সকল শাখা প্রশাখা মস্তিস্ক থেকে বার্তা বয়ে নিয়ে যায় তাদেরকে মোটর নার্ভস বলে। এরা মস্তিস্কের ভিতরের দিকে ধুসর বস্তু বা গ্রে ম্যাটারের সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

২. সেনসরী নার্ভসঃ ¯œায়ুর যে সকল শাখা প্রশাখা দেহের বাহিরের অংশ থেকে অনুভুতি বয়ে নিয়ে যায় তাদেরকে বলে সেনসরী নার্ভস এরা মস্তিস্কের বাহিরের দিকের সাদা বস্তু বা হোয়াইট ম্যাটারে সম্পৃক্ত।

৩. অটোনমিক নার্ভসঃ এছাড়া তৃতীয় প্রকার ¯œায়ু হচ্ছে অটোনমিক নার্ভস যা শরীরের ভিতরের যন্ত্র গুলিকে নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত রাখে। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা অনুভুতিহীন।

অস্থি বা হাড়

এটি দেহকে শক্তভাবে ধরে রাখে, দেহের ভারসম্য রক্ষা করে, দেহকে নড়াচড়া করায় এবং ভেতরের মুল্যবান যন্ত্রাংশগুলিকে বাহিরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। লবন, আয়রণ, ফসফরাস, আয়োডিন ও ভিটামিনের সাথে মিশ্রিত হয়ে মানব কঙ্কাল তৈরী হয়। হাড়কে মুলতঃ ৪ টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন: অস্থি বা হাড়, উপাস্থি, অস্থি সন্ধি ও অস্থি মজ্জা।

১. অস্থি বা হাড়- এটি মানব দেহের প্রধান অস্থি। এটি বড়, শক্ত ও ক্রম-র্বধনশীল। অস্থির গঠন ৪ ধরনের হয়ে থাকে:-

(ক) শূণ্যর্গভ লম্বা অস্থি। যেমন- হাত-পায়ের হাড়।

(খ) চেপ্টা অস্থি। যেমন- মাথার খুলি।

(গ) ছোট ছোট অস্থি। যেমন- আঙুলের হাড়।

(ঘ) আঁকা-বাঁকা অস্থি। যেমন- কোমড়, মেরুদন্ড এর হাড়।

২. উপাস্থি- এগুলো নরম অথচ মজবুত। টানলে বড় হয়। শিশু জন্মাবার সময় তার দেহে প্রায় সবই উপাস্থি থাকে। পরর্বতীতে এগুলো অস্থিতে পরিনত হয়। কিছু কিছু উপাস্থি কোন দিনই অস্থিতে পরিণত হয় না। যেমন:- দুটি সন্ধি ও বন্ধনীর মধ্যর্বতী ছোট ছোট উপাস্থি। এরা অস্থিগুলিকে র্ঘষনের হাত থেকে বাঁচায়।

৩. অস্থি সন্ধি- দুটি অস্থির মিলনস্থল বা জয়েন্টকে অস্থি সন্ধি বলে । যেমন- হাটু বা কনুই এর জয়েন্ট। এরা মানুষকে ওঠা-বসা, হাঁটা চলা ইত্যাদি করতে সাহায্য করে।

৪. অস্থি মজ্জা- ফাঁপা লম্বা হাড় বা চেপ্টা হাড়ের মধ্যে থাকে মজ্জা। এর থেকে রক্তের কিছুটা অংশ তৈরী হয়। শিশুদের মজ্জা থাকে আঠার মত প্রায় তরল। বড়দের মজ্জা গাঢ় ও চর্বিযুক্ত হয়।

মাংসপেশী

কোষ, টিসু বা কলা দিয়ে তৈরী হয় মাংসপেশী। এগুলি ২ ধরনের-

১. ইনভলেন্টারি মাসেলস্ - পাকস্থলী, অন্ত্র, শ্বাসনালী ইত্যাদি মাংস পেলীগুলো নিজে থেকেই কাজ করে যায় এবং এরা কোন ইন্দ্রিয়ের অধীন নয়। তাই এরা ইনভলেন্টারি মাসেলস।

২. ভলেন্টারি মাসেলস- হাত, পা, গলা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছা মত কাজ করে বলে এরা ভলেন্টারি মাসেলস।

এ সকল পেশী দেহের সঞ্চালক সুক্ষè অনেকগুলি মাসল ফাইবার দিয়ে গঠিত। পেশী সাধারণতঃ বন্ধনী বা লিগামেন্ট হাড়ের সাথে সংযুক্ত থাকে। প্রত্যেক পেশী ¯œায়ু দ্বারা চালিত হয়।

চর্বি

চর্বি তৈরী হয় এক ধরনের সাদা তৈলাক্ত পর্দাথ দিয়ে। এর মুল উপাদান হচ্ছে ¯েœহ বা তেল জাতীয় খাদ্য। এগুলি মাংস পেশীর বাহিরের দিকে চামড়ার নিচে থাকে। চর্বি দেহের তাপকে রক্ষা করে এবং শক্তিকে মওজুদ বা রির্জাভ করে।

ত্বক

শরীরের বাইরের আবরণটিকে ত্বক বলে। এটি দুই পরত বিশিষ্ট হয়। যথা:- অন্তঃত্বক ও বহিঃত্বক। ত্বকের মধ্যে অসংখ্য লোমকুপ বা ঘাম বের হবার পথ থাকে। এ লোমকুপগুলি নিয়মিত গোসলের মাধ্যমে পরিস্কার রাখতে হয়। ঘামাচি পাউডার ব্যবহার করলে লোমকুপের ছিদ্র বা মুখ বন্ধ হয় যা শরীরের ক্ষতি করে।

গ্রন্থি

শরীরের মধ্য থেকে ঘাম, রস, লালা ইত্যাদি বের হবার নালী গুলোকে গ্রন্থি বলে। এগুলি চামড়ার নিচে অবস্থিত এবং এক ধরনের এপিথেলিয়াম টিসু দ্বারা নির্মিত।

চুল, লোম ও নখ

চুল ও লোমের গোড়াগুলি ত্বকের অভ্যন্তরে এডিপোজ টিসু দ্বারা যুক্ত থাকে। চুলের গোড়ায় অবস্থিত ফলিকস এর সাথে নার্ভের সংযোগ থাকে বলেই চুল টানলে ব্যথা লাগে।

নখের অগ্রভাগের সাথে নার্ভের সংযোগ থাকে না। তাই এগুলো কাটলে ব্যাথা লাগে না। কিন্তু নখের গোড়া ও মধ্যর্বতী অংশের সাথে নার্ভের সংযোগ থাকে।

নরঃ কঙ্কাল বা স্কেলিটন

কঙ্কাল হচ্ছে মানুষের শরীরের আভ্যন্তরিন কাঠামো, অনেকটা দালানে ব্যবহৃত রডে খাঁচার মতই। মানবদেহে মোট ২০৬ টি হাড় আছে। এ গুলোকে ১২ টি ভাগে ভাগ করা যায়। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য-

মেরুদন্ড

মাথার করোটির নিচ থেকে পিঠ ও কোমড় হয়ে বস্তিদেশ পরান্ত লম্বভাবে এর অবস্থান। অনেকগুলো ছোট ছোট হাড় যুক্ত হয়ে এই লম্বা মেরুদন্ডটি গঠিত। পুরো মেরুদন্ডটিকে বলে ভার্টিব্রাল কলাম। ঘাড়ের নিচে ৭ টুকরা হাড় ও কোমড়ের নিচে ৫ টুকরা হাড়ের নাম ভার্টিব্রা। তার নিচের ত্রিকোণাকৃতির ৫ টি হাড়ের নাম সেক্রাম। সর্বশেষের ছোট ছোট ৪ টি হাড়ের নাম কক্সিক্স।

এ সকল ছোট ছোট হাড়ের র্গত গুলির মধ্য দিয়ে যে নালীর সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে থাকে সুষুম্না কান্ড বা স্পাইনাল র্কড যা ব্রেইন থেকে নিচে নেমে আসে।

মাথার ও মুখের হাড়

মাথার খুলিটি একটি গোলাকার ফাঁপা পাত্রের মত যার মধ্যে থাকে মস্তিস্ক। অনেকগুলো হাড় নিয়ে মাথার খুলিটি গঠিত। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাড়গুলি হচ্ছে-

১. কপালের দিকের হাড়

২. মাথার দুপাশের দুটি হাড়

৩. মাথার পিছনের চেপ্টা হাড়

৪. কানের দু পাশের দুটি হাড়

৫. মস্তিস্কের গোড়া

৬. চোঙের পিছনের দিকের স্পঞ্জের মত হাড়

৭. মুখের হাড় গুলি। ইত্যাদি।

বুকের হাড়

মেরুদন্ডের ভার্টিব্রা থেকে আগত ২৪ টি (বার জোড়া) হাড় সামনের দিকে বক্র হয়ে এগিয়ে এসেছে। এগুলোকে পাঁজরের হাড় বা রিব বলে। এর মধ্যে ৭ জোড়া রিব সামনের চেপ্টা লম্বা হাড়ের সাথে যুক্ত থাকে। এর নাম হচ্ছে স্টারনাম। আর ৩ জোড়া উপাস্থি দিয়ে উপরের পাঁজরের সাথে যুক্ত থাকে। বাকি ২ জোড়া হাড় সামনের দিকে যুক্ত থাকে না বরং ভাসমান থাকে। বুকের পাঁজরের হাড়গুলো মিলে যে খাঁচা তৈরী করে তা মধ্যেই সুরক্ষিত থাকে ফুসফুস, লিভার, হৃৎপিন্ড, শ্বাসনালী ইত্যাদি।

বস্তিদেশের হাড়

দুদিকের দুটি চেপ্টা বড় বড় ইলিয়ামের সংগে যুক্ত দুটি হাড়- ইসকিয়াম ও পিউবিস। এর সংগে যুক্ত কোমড়ের পিছনের মেরুদন্ডের শেষের ত্রিকোণাকার অস্থির নিচের ফাঁকা অংশ, মাঝখানে চারিদিকে গোলাকার কোটরের সৃষ্টি হয়েছে। এই কোটরে বৃহৎ অন্ত্রের অনেকটা অংশ, মুত্রথলি, জনন যন্ত্র ইত্যাদি রক্ষিত থাকে।

হাতের হাড়

কাঁধের হাড়ের সাথে সংযুক্ত থাকে হাতের দুটি হাড়। এর নাম হচ্ছে রেডিয়াস। রেডিয়াসের পরে থাকে হাতের অনেকগুলি টুকরা হাড়। এদের নাম- করপাল ও মেটাকরপাল বোনস্।

কাঁধের উপরের পিছনের দিকে দুটি ত্রিকোণাকৃতির হাড় দেখা যায়। এবং সামনে দুটি কলার বোন বা স্কাভিকল দেখা যায়।

পায়ের অস্থি

পা এর উপরের হাড়টি সবচেয়ে মোটা ও দৃঢ় এবং এটিই দেহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাড়। উপরের বস্তিদেশের মধ্যকার একটি র্গত বা এসেটিবুলামের সাথে এটি একটি সকেট জয়েন্ট সৃষ্টি করেছ। এর নাম ফিমার। এর নিচে আর একটি লম্বা হাড় আছে যার নাম টিবিয়া। ফিমার ও টিবিয়ার জয়েন্টের সামনে দিকে থাকে মালাই চাকির হাড় এবং নিচে কতগুলো ছোট ছোট হাড থাকে।

মানব দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলি

১. মাথাঃ এর মধ্যে আছে মস্তিস্ক বা ব্রেইন। মুখমন্ডলে আছে চোখ ও অক্ষিগোলক, নাক, কান ও তা ভিতরের অংশগুলি, মুখ ও জিহ্বা, দাঁত ও মাড়ি ইত্যাদি।

২. বুকঃ এর মধ্যে আছে শ্বাসনালী, স্বরযন্ত্র, ফুসফুস, বৃহৎ ধমনি ও শিরাগুলি, হৃৎপিন্ড বা হার্ট ইত্যাদি

৩. বুক ও পেটের মাঝখানেঃ এখানে একটি মাংশপেশী দ্বারা নির্মিত ব্যবচ্ছেদ পেশী আছে যা বুক ও পেটকে আলাদা করে দিয়েছে। এর নিচেই পেটের ভিতরের অংশে থাকে- লিভার, প্লীহা, অন্ত্র, পাকস্থলী, গলব্লাডার বা পিত্তথলি, কিডনী বা মূত্রাশয় ইত্যাদি।

৪. বস্তিকোটরঃ এই অংশে থাকে মুত্রনালী, মুত্রথলি, নারীর জরায়ু ও গর্ভাশয়, পুরুষের জননযন্ত্র ও প্রস্টেট ইত্যাদি।

মানব দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলি সম্পর্কে নিচে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

মস্তিস্ক

মস্তিস্ক হচ্ছে মানব দেহের প্রধান কার্য্যালয় বা হেড অফিস। মানব দেহের অনুভুতি, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আস্বাদন, চিন্তা,বুদ্ধি, চেতনা, বিশ্লেষণ এ সব কিছুই হচ্ছে মস্তিস্কের কাজ। দেহের সকল ¯ায়ু বা নার্ভ গুলি মস্তিস্কের সাথে সংযুক্ত এবং এগুলো প্রতিনিয়তই মস্তিস্কে বার্তা পাঠায় আর মস্তিস্ক তা অনভব করে। এরপর মস্তিস্ক এই বার্তাকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট অংগ- প্রত্যঙ্গকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে।

মস্তিস্কের মুলতঃ ৩ টি অংশ। যথা:- ১. অগ্র মস্তিস্ক অংশ ২. প্রধানতঃ সংযোগকারী অংশ ৩. কেন্দীয় অংশ বা হিন্ড ব্রেইন।

এটি সেরিবেলাম ও মেডালা অব লবাঙ্গটা সহ অনেক দুর্লভ উপাদান দিয়ে গঠিত। দেখা, শুনা, বুঝা, ঘ্রাণ নেয়া, স্বাদ গ্রহণ করা ইত্যাদি সব কিছুর জন্যই মস্তিস্কের পৃথক পৃথক বিভাগ রয়েছে। মস্তিস্কের গঠন ও কার্যপ্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল।

চক্ষু

মখের অস্থিগুলির মধ্যে গোলাকার গর্তের ভিতরে চক্ষগোলক **হাব-১৩**

ও চক্ষুমণি বা আইবল অবস্থিত। গোলকটির পিছনের দিকে যুক্ত থাকে অপটিক নার্ভ যা চোখের দেখা দৃশ্যগুলি মস্তিস্কে পৌঁছায়।

তিনটি পর্দা বা আবরণ দ্বারা চক্ষুগোলক আবৃত থাকে। এর বাহিরের মোটা, সাদা ও শক্ত আবরণটির নাম স্কেনেরা। সামনের দিকে এটি স্বচ্ছ ও সাদা। এর নাম কর্ণিয়া। কর্ণিয়ার মাঝে যে ছোট গোল ছিদ্র থাকে তাকে বলে পিউপিল।

স্কেনেরার মধ্যে থাকে কোরওয়েড নামে একটি আবরণ যাতে থাকে অসংখ্য রক্তবহা নালীর জাল। আরও ভিতরে থাকে অসংখ্য ¯ায়ু দ্বারা গঠিত একটি আবরণ যার নাম রেটিনা।

সামনের দিকের যে গোল অংশে কোরওয়েড শেষ হয়েছে, তাকে বলে সিলিয়ারী বডি ও তাতে আইরিস নামক পর্দা থাকে। আইরিসের ঠিক পিছনেই থাকে একটি লেন্স। এটি একটি নার্ভ দ্বারা আবদ্ধ থাকে। লেন্সের মধ্য দিয়ে আলো গিয়ে পড়ে রেটিনার উপর। সেখান থেকে নার্ভ দ্বারা বাহিত হয়ে অনুভুতি চলে যায় ব্রেইন এর মধ্যে। তাই আমরা দেখতে পাই।

চক্ষুগোলকের উপরে ও নিচে দুটি অনুভুতিশীল ল্যাক্রিমিয়াল গ্ল্যান্ড থাকে। শোকে-দুঃখে বা রোগে কষ্ট পেলে এই গ্ল্যান্ড দুটি থেকে বেশী জল পড়ে। তাছাড়া, সব সময়ই সামান্য জল এসে চোখকে ভিজা ও পিচ্ছিল রাখে।

নাক

অনেকগুলি ছোট ছোট হাড় দিয়ে নাক গঠিত। তার সংগে থাকে কতগুলি উপাস্থি। নাকের ভিতরের অংশটি ঝিল্লি দ্বারা আবৃত যা বাইরের ধুলা-বালু ও ময়লাকে আটকে দেয়।

কান

মাথার দুপাশের দুটি টেম্পোরাল বোনের মধ্যে দুটি গর্ত থাকে। এই গর্তের সংগেই যুক্ত থাকে দুটি কান। কান দিয়ে শব্দ ভিতরে যায় এবং তা কর্ণপটে আঘাত ও কম্পন সৃষ্টি করে। কানের তিনটি অংশ:-

১. বহিঃকর্ণ- বাইরের কানের চোঙা বা পিন্না ও তার মধ্যবর্তী গর্ত বা কর্ণকূহর নিয়ে এই অংশ গঠিত। এর শেষ ভাবে টিমপ্যানিক মেমব্রেন নামে একটি পর্দা আছে। **হার-১৪**

২. মিডল ইয়ার- এটি মেমব্রেনের ভিতরের দিকের বায়ুর্পূণ ছোট একটি সুরঙ্গ। এর মধ্যে আছে তিনটি হাড়। কর্ণপটে যে শব্দ এসে ধাক্কা দেয় তা এই তিনটি হাড়ে স্পন্দন তোলে।

৩.অন্তঃকর্ণ- এটি জলর্পূণ অনেকগুলি প্যাঁচানো নালীর সমষ্টি। এর সাথে সরু সরু ¯ায়ু বা অডিটারী নার্ভ যুক্ত থাকে। এর মাধ্যমেই স্পন্দনের সংকেত সোজা মস্তিস্কে চলে যায় এবং আমরা কানে শুনতে পাই।

স্বরযন্ত্র

গলার মধ্যে জিহ্বার গোড়ার দিকে শ্বাস-প্রশ্বাসের নালীর উপরের অংশে স্বরযন্ত্রটি অবস্থিত। এটি শ্বাসনালী হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে। এরই সাহায্যে আমরা শব্দ করতে ও কথা বলতে পারি। তাই একে স্বর বাক্সও বলা যায়।

গলকক্ষ

এটি খাদ্য বহনকারী অন্ননালীর উপরের অংশ। এর মধ্যে একটি আলজিব ও তার দুপাশে দুটি গ্রন্থি বা টনসিল থাকে।

বক্ষ গহ্বর

দেহের কতগুলো প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ধারন করার জন্যই বক্ষ গহ্বর। সহজ কথায় এটি হচ্ছে বুকের ভিতরের ফাঁপা অংশ। এর মধ্যে রয়েছে-

১.দুটি ফুসফুস

২.একটি শ্বাসনালী। শ্বাস নালী দুভাগে ভাগ হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে। - অন্নবহানালীর উপরের অংশ ও হৃৎপিন্ড।

ফুসফুস

বুকের খাঁচা বা বক্ষপিঞ্জরের দুদিকে দুটি ফুসসুস থাকে। এদের ডান দিকেরটিতে ৩ টি লুব ও বামেরটিতে ২টি লুব থাকে। তাই বাম দিকের ফুসফুসের পাশে যে খাঁজ বা থলি জায়গা তৈরী হয়েছে সেখানেই থাকে হৃৎপিন্ড।

ফুসফুসের কাজ হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করা, হৃৎপিন্ড থেকে অশুদ্ধ রক্ত নিয়ে তাকে শুদ্ধ করা। ফলে আমরা শ্বাস প্রশ্বাসের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি।

হৃৎপিন্ড

মানব দেহের রক্তকে পাম্পিং করার যন্ত্রটির নামই হলো **হাব-১৫**

হৃৎপিন্ড বা হৃদয়। ধমনী, রক্তনালী, শিরা-উপশিরার মাধ্যমে এটি শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্ত পৌছে দেয়। এই রক্ত প্রবাহিত হয়ে আবার তা হৃৎপিন্ডেই ফিরে আসে। দেহের আকার ভেদে একজন সুস্থ্য মানুষের দেহে ৫ থেকে ৬ লিটার পরান্ত রক্ত থাকতে পারে।

বাম দিকের ফুসফুসের পাশে যে খাঁজ বা থলি জায়গা তৈরী হয়েছে সেখানেই হৃৎপিন্ড থাকে। এর কিছুটা অংশ ডান দিকের ফুসফুসের পাশেও অবস্থান করে। হৃৎপিন্ড মোট ৪ টি অংশে বিভক্ত। যথা:-

১. ডান অলিন্দ
২. ডান নিলয়
৩. বাম অলিন্দ
৪. বাম নিলয়

হৃৎপিন্ডের সাথে যে সব রক্তনালীর সংযোগ থাকে সেগুলো হচ্ছে-

১. প্রধান ধমনী
২. প্রধান দুটি শিরা
৩. ফুসফুসের প্রধান ধমনী
৪. ফুসফুসের প্রধান শিরা

নাড়ীর গতি

প্রতি মিনিটে হৃৎপিন্ডের স্পন্দন কত বার তা আমরা যে কোন বড় ধমনীতে চাপ দিয়েই বুঝতে পারি। এর থেকেই হার্টের অবস্থা ভাল বা খারাপ বুঝা যায়। প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্বভাবিক গতি-

১. জন্মের সময় ১৩০-১৪০ বার
২. কৈশরে ১০০-১২০ বার
৩. যৌবনে ৭২-৮০ বার
৪. বার্ধক্যে ৬০-৭২ বার

ব্যবচ্ছেদ পেশী

বক্ষ গহ্বরের নিচে একটি পাতলা পর্দা থাকে যার নাম ব্যবচ্ছেদ পেশী। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বুক ও গহ্বরকে পৃথক করা। পর্দাটি পাঁজরা ও মেরুদন্ডের সাথে যুক্ত থাকে। এর উপরে থাকে দুটি ফুসফুস ও হৃৎপিন্ড, আর নিচে থাকে লিভার, প্লীহা, পাকস্থলী, অন্ত্র ইত্যাদি। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে এই পেশী সংকোচিত ও প্রসারিত হয়। **হার-১৬**

উদর গহ্বর

ব্যবচ্ছেদ পেশীটির নিচের অংশটিই হচ্ছে উদর গহ্বর। উদর গহ্বরের মধ্যে থাকে-

১.পাকস্থলী ২.ক্ষুদ্র অন্ত্র ৩.বৃহৎ অন্ত্র ৪. যকি্ৎ ৫.প্যানক্রিয়াস ৬. মুত্রাশয় ৭. মুত্রগ্রন্থি ৮.মুত্রনালী ৯. জনন যন্ত্র।

পাকস্থলী

পাকস্থলী হচ্ছে একটি বড় থলির মত। এখানেই প্রথম খাদ্য জমা হয়। পাকস্থলীতে মোট ৪ টি স্তর আছে। যথা: -

১. সবার উপরে পাতলা ঢাকনা বা পেরিটোনিয়াম

২. তার নিচের মাংসপেশী নির্মিত স্তরটি বার সংকোচিত ও প্রসারিত হয়ে খাদ্য বস্তকে হজমে সাহায্য করে।

৩. তৃতীয় স্তরের নাম সাবমিউকাস লেয়ার। এতে থাকে সরু সরু অজস্র শিরা-উপশিরার বা ধমনীর জাল।

৪. চর্তুথ স্তরে থাকে ঝিল্লি বা মিউকাস মেমব্রেন যা ভিতরটাকে সম্পূর্ণ আবৃত রাখে।

পাকস্থলীর চারটি স্তরের মধ্যে সবচেয়ে ভিতরের স্তরটি কিছুটা আঁকা-বাঁকা ভাঁজযুক্ত হয়। ঝিল্লি স্তরের নিচে থাকে অনেকগুলি গ্রন্থি যা পাচক রস বা হজম রস নির্গত করে খাদ্যকে হজম করতে সাহায্য করে। বাকি হজমের কাজটা হয় ক্ষুদ্র অন্ত্রে। পাচক রসের প্রধান বস্তুগুলি হচ্ছে-

১. পেপসিন- যা আমিষ জাতীয় খাদ্যকে হজম করে।

২. রেনিন- যা দুধকে ছানায় রূপান্তর করে হজম করে।

৩. লাইপেজ- যা তৈল-চর্বিকে হজমে সাহায্য করে।

৪. টায়ালিন- শর্করা জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

পাকস্থলীর কাজ হচ্ছে ভুক্তদ্রব্যকে চটকে কাইয়ের মত তৈরী করা। তারপর সেটা যায় ইংরেজী "ইউ" আকৃতির অংশে যার নাম ডিউডেনাম। পাকস্থলীর নির্গমন দ্বারের মধ্যে একটি কপাট বা ভালভ থাকে। খাদ্য ভালভাবে পরিপাক না হলে তা অন্ত্রে যেতে পারে না।

অন্ত্র

পাকস্থলী দ্বারা ভুক্তদ্রব্যগুলি যে যে পথে ভ্রমণ করে এর সবগুলিই হলো অন্ত্র। এর অংশগুলো হচ্ছে-

১. "ইউ" আকৃতির ডিউডিনাম

২. ক্ষুদ্র অন্ত্র

৩. বৃহৎ অন্ত্র

৪. মলাশয়

ডিউডিনাম এর খাঁজের মধ্যে অবস্থিত প্যানক্লিয়াস থেকে ক্লোম রস আর লিভার থেকে ডিওরস ডিওডিনামে প্রবেশ করে। এ সব রস হজমে বিশেষ সহায়তা করে। ক্ষুদ্র অন্ত্র থেকেও এক ধরনের অন্ত্ররস নিঃসৃত হয়। ক্ষদ্র অন্ত্রটি বিরাট লম্বা, কিন্তু পাকানোভাবে থাকে বলে এটি অল্প জায়গাতেই থাকে বৃহৎ অন্ত্রের ২ টি মুল অংশ-

১. সিকাম- এটি একটি থলির মত। এর সাথে থাকে ছোট অ্যাপেনডিক্স। তা কোন কাজ নেই। তবে খাদ্য যদি কখনও এর মধ্যে প্রবেশ করে তখন অ্যাপেনডিসাইটিস রোগ হয় এবং জরুরী ভিত্তিতে অপারেশন প্রয়োজন।

২. পরিপাক যন্ত্রাদি- এর ৪ অংশ-(ক) উর্ধ্বমুখী বৃহৎ অন্ত্র(খ) আড়াআড়ি বৃহৎ অন্ত্র (গ) নি¤œমুখী বৃহৎ অন্ত্র (ঘ) বস্তিদেশের বৃহৎ অন্ত্র বৃহৎ অন্ত্রে সমস্ত জলীয় অংশ শোষিত হয়। তাছাড়া এখানে মল তৈরী হয়। যদি খাদ্যে শোষিত হয় না এমন পদার্থ (যেমন-সেলুলোজ) কম থাকে তবে মল তৈরীতে অসুবিধা হয় এবং কোষ্ঠ্য কাঠিন্য হয়। তাই প্রত্যহ শাক-সবজি ও ফল-মুল খাওয়া উচিত।

যকৃৎ ও পিত্তকোষ

যকৃৎ বা লিভার হচ্ছে পিংক কালারের একটি বিরাট লম্বাটে পিরামিড আকৃতির যন্ত্র যা ব্যবচ্ছেদ পেশীর নিচ দিয়ে উদর গহ্বরের ডান দিকে অবস্থান করে। তবে এর শেষ প্রান্ত কিছুটা বাম দিকেও আসে। এটি ৬ ইঞ্চি চওড়া এবং ১২ ইঞ্চি লম্বা। অবশ্য লিভার বর্ধিত হলে বা কোন রোগের কারণে এর আকার বেড়েও যেতে পারে। যকৃৎ বা লিভারের স্বাভাবিক ওজন হচ্ছে ১২০০ থেকে ১৪০০ গ্রাম। লিভারকে ডান ও বাম এই দুটি অংশে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগেই অনেক উপখন্ড রয়েছে।

খাদ্যাংশ হজম হবার পর তা লিভারে এসে পৌঁছে এবং তা দেহের কাজে লাগার উপযুক্ত হয়ে উঠে। দেহের মধ্যে খাদ্য শোষণ হবার পর আবার তা লিভারে ফিরে আসে এবং বিপাক হতে শুরু করে। যেমন:- কিছু গ্লুকোজ জমে গ্লাইকোজেন রূপে আবারও দেহের

কিছু কাজে ও তাপ সৃষ্টিতে ব্যয় হয়। রক্তের লোহিত কণিকা (জইঈ) নির্দিষ্ট সময় পর ধ্বংশ হয় ও তা লিভারে এসে বাইল পিগমেন্ট, বিলি-রুবিন, ইত্যাদি সৃষ্টি করে। অথচ তা আবার পিত্তরসের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। আবার, এতে থাকে বাইল সল্ট যা হজম ক্রিয়াতে ব্যপক সাহায্য করে। লিভারের মধ্যে দেহের সব খাদ্য শোষিত হয় ও এর বিরাট পরিবর্তন ঘটে বলে একে দেহের ল্যবরেটরীও বলা হয়ে থাকে।

মুত্রযন্ত্রাদি

শরীর থেকে প্রতিদিন কয়েকবার যে মুত্র নির্গত হয়, তা ক্রিয়া সম্পন্ন হয় কয়েকটি যন্ত্রের মাধ্যমে। এগুলো হচ্ছে-

১. মুত্রগ্রন্থি ২. মুত্রনালী ৩. মুত্রথলি বা মুত্রাশয় ৪. মুত্রবর্হিগমন

কিডনীদ্বয়

মেরুদন্ডের দুপাশে দুটি কিডনী থাকে। এদের প্রধান কাজ হলো রক্তকে ছেঁকে পরিস্কার করা।

প্রতিটি কিডনীর মধ্যে আছে অসংখ্য ছোট ছোট গ্লোমেরুলাস বা ছাঁকনির একক। রেনাল আর্টারী দিয়ে রক্ত কিডনীতে আসে, তার পর যায় গ্লোমেরুলাসে। সেখানে সক্ষতম জালিকার মাধ্যমে ছাঁকা হয়ে গেলে আবার রক্ত রেন্যাল ভেইন দিয়ে ফিরে চলে যায়। রক্তের প্রধান দুষিত পদার্থগুলি (ইউরিয়াম ইউরিব এ্যাসিড, ডিপিউরিক এসিড, জ্যানথাইন ইত্যাদি) মুত্রের সাথে বের হয়ে যায়।

কিডনী ঠিকমত কাজ না করলে বা তাতে ইনফ্লামেশন হলে শরীরে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হাত পা ফুলে যায়, প্র¯াব হয় না। এ রোগের নাম নেফ্রাইটিস।

প্রজনন যন্ত্র

নারী-পুরুষের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রজনন যন্ত্রের সাহায্যেই সন্তান সন্ততি জন্ম লাভ করে। পুরুষ প্রজনন যন্ত্রের কাজ হচ্ছে শুক্র উৎপাদন ও তা নারী দেহে প্রয়োগ করা। আর নারী প্রজনন যন্ত্রের কাজ হচ্ছে প্রাপ্ত শুক্রের সাথে নিজের উৎপাদিত ভ্রুণকে মিলিয়ে সন্তান তৈরী করা এবং তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া

পুরুষ প্রজনন যন্ত্র

এটিকে মোট ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:-

(১) অন্ডকোষ ও অন্ডদ্বয় ও এপিডিডিমিস (২) শুক্রনালী

(৩) শুক্রথলি (৪) প্রষ্টেট গ্রন্থি (৫) যৌন ইন্দ্রিয়।

ইন্দ্রিয়ের ঠিক নিচেই দুটি ঝুলন্ত অন্ডকোষ থাকে। এদের কাজ হচ্ছে শুক্র উৎপাদন করা। শুক্র গুলো শুক্রবাহী নালী দ্বারা এপিডিডিমিসে এসে জমা হয়। এরপর প্রষ্টেট গ্রন্থি হয়ে শুক্রথলিতে জমা হয়। আবার তা প্রয়োজনের মুহূর্ত্বে প্রস্টেট গ্রন্থি হয়েই বের হয়ে আসে।

নারী প্রজনন যন্ত্র

নারীদের অর্ন্তজননেন্দ্রিয় প্রজনন অংশ ৪ টি ভাগে বিভক্ত। যথা:-

(১) যোনী পথ (২) জরায়ু (৩) ডিম্বনালী (৪) ডিম্বকোষ।

স্বভাবিক অবস্থায় প্রতি ২৮ দিন পর অর্থাৎ মাসিক ¯াবের পর পরই ডিম্বকোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ ডিম্ব নির্গত হয়। এরা ডিম্বনালীতে অবস্থান করে প্রায় ৭-৮ দিন বেঁচে থাকে। এ সময়ে নারী যোনী- পথে কোন পুরুষের শুক্র প্রবেশ করতে পারলে তা এই ডিম্বের সাথে মিলিত হয়। শুক্র-ডিম্বের মিলনের ফলে ভ্রুণ সৃষ্টি হয় এবং তা জরায়ু বা নারী গর্ভাশয়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। অবশেষে প্রায় ২৮০ দিনে এই ভ্রুণ একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে রূপ লাভ করে এবং পৃথিবীতে আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

হাতের পেশী, শিরা ও ধমনী

বাহুতে প্রধানতঃ তিনটি পেশী থাকে। যথা:-

১. দ্বিমুল বা বাইসেইপস্ মাসেলস্ - এটি সামনের দিকে অবস্থিত। এর এক প্রান্ত রেডিয়াস অস্থির সাথে সংবদ্ধ এবং অপর প্রান্ত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তাই এটি দ্বিমুল মাংসপেশী।

২.ত্রিমুল বা ট্রাইসেইপস্ মাসেলস্-এটি বাহুর পেছনের দিকে অবস্থিত। এর এক প্রান্ত নিচে প্রকোষ্ঠ অস্থির সাথে সংবদ্ধ এবং উপরের প্রান্ত তিন ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ স্কন্ধ অস্থি বা স্ক্যাপুলার সংগে এবং অন্য দুই ভাগ হিউ -মারাস এর সংগে যুক্ত। ৩টি ভাগের কারনে একে ত্রিমুল মাংসপেশী বলে।

৩. ডেলটয়েড মাসেলস্- বাহুর উপরের অংশে বাহিরের দিকে ত্রিকোণ বা ল্যাটিন ডেলটা চিহ্ন এর মত দেখতে এই পেশীটি। তাই এ নাম ডেলটয়েড মাসেলস্। সাধারণতঃ এই পেশীতেই ইনট্রামাসকুলার ইনজেকশন দেয়া হয়ে থাকে।

এগুলো ছাড়াও কাঁধের উপরে থাকে বিরাট ত্রিভুজাকার ট্রাপিজিয়াস মাসেলস্ । কনুই এর নিচে ও হাতের পিছনে লম্বা লম্বা পেশী। এগুলো ২ টি ভাগে বিভক্ত। সামনের পেশী হাতকে সংকোচিত করতে সাহায্য করে, তাই এদের বলে ফ্যাক্সার মাসেলস্ । পেছনের পেশী গুলো হাতকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে বলে এ গুলো এক্সটেনসর মাসেল

তাছাড়া, হাতের করতলে ও আঙ্গুল গুলোতে অনেক ছোট ছোট পেশী আছে বলেই আমরা হাত নাড়াতে,লিখতে ও আঁকতে পারি।

হাতের ধমনী, শিরা ও ¯ায়ু

হাতের প্রধান ধমনী একটি যার নাম অক্সিলিয়ারী আর্টারী। এটি নিচের দিকে গিয়ে হয়েছে ব্রক্কাল আর্টারী। কনুই এর সামনে এটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একটি রেডিয়াল আর্টারী, অপরটি ইউরিনাল আর্টারী। কব্জির সামনে এই রেডিয়াল আর্টারী চেপে ধরেই আমরা নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করি।

ধমনী গুলোর সাথে সমন্তারালভাবে গিয়েছে শিরাগুলো। এগুলো উপরে থাকে বলে আমরা চামড়ার নিচেই এদের উপস্থিতি টের পাই। কনুইয়ের সামনে যে শিরা আছে সেখানে তিনটি ¯ায়ু থাকে। যথা:- (১) পায়ুর পেছন দিয়ে ঘুরে যায় রেডিয়াল নার্ভ। এটি হাতের পেছনের দিকে অবস্থান করে (২) সামনের দিকের ২টি নার্ভের মধ্যে একটি হচ্ছে মেডিয়ান নার্ভ এবং (৩) অপরটি হচ্ছে আলনার নার্ভ।

এ সকল ¯ায়ুই মেরুদন্ডের মধ্যে স্পাইনাল র্ব্ড থেকে উদ্ভূত মোটা ¯ায়ুর সমষ্টি যা ব্রক্কিয়াল প্লেক্সাস থেকে উদ্ভ'ত।

পায়ের পেশী

পায়ের পেছনে কোমড়ের দুপাশে দুটি প্রধান পেশী বা গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস অবস্থিত। এর নিচে থাকে দুটি গ্লটিয়াস মেডিয়াস এবং গ্লটিয়াস মিনিমাস পেশী। কোমরে বা পাছায় এই পেশীর বাইরের অংশের মাঝামাঝি ইন্ট্রামাসকুলাস ইনজেকশনগুলি দেয়া হয়।

এর পর প্রধান পেশী হলো উরুদেশের পেশীগুলি। সামনে ও পিছনে অনেকগুলি পেশী আছে।

উরুর সামনের মোটা মাংসপেশী বস্তি অস্থি থেকে বন্ধনীর আকারে নেমে এসে উরু গ্রন্থির সাথে যুক্ত হয়েছে। তারপর সেটি স্থুল আকার ধারন করেছে এবং অবশেষে তা নিচে আবার সক্ষ¥ হয়ে

মালাই চাকির সংগে যুক্ত হয়েছে।

উরুর পেছনের মাংসপেশী হাতের দ্বিমুল মাংসপেশীর মতই। এর একটি অংশ পেছনের জঙ্ঘার অংশের সাথে যুক্ত। অপর অংশ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে উরু অস্থি ও সেক্রামের সংগে যুক্ত থাকে।

হাঁটুর নিচে আছে পিন্ডের আকারের পেশী। এই পেশী সম্মুখ জঙ্ঘাদি এর পেছনে অবস্থিত। এটি ও বেশ মোটা পেশী হলেও চিকিৎসার দিক থেকে এর ততটা প্রাধান্য নেই। এ ছাড়াও পায়ে ছোট ছোট অনেক পেশী আছে যার জন্য আমরা দাঁড়াতে, হাঁটতে ও চলতে পারি।

পায়ের ধমনী, শিরা ও ¯ায়ু

পায়ের প্রধান ধমনী হলো ফিমোরার আর্টারী। এটি নিচে নেমে এসে হাঁটুর কাছ থেকে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এ দুটি ভাগ হাঁটুর পেছনে রয়েছে। এই ধমনী দুটির নাম হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার ট্রাইবয়ল ও পোস্টিরিয়ার ট্রাইবিরল আর্টারী।

এই দুটি ধমনী নিচে নেমে এসে পায়ের পাতার নিচে মিলে একটি আর্চ তৈরী করেছে। তা থেকে সরু সরু ধমনী আঙ্গুল গুলিতে রক্ত প্রেরণ করে। পায়ের শিরা গুলিও ধমনীর সংগে সমান্তারাল ভাবে থাকে। পায়ের প্রধান ¯ায়ু হলো উরুর পেছনে অবস্থিত স্পাইনাল র্ক্ড। থেকে উদ্ভুত সায়াটিক নার্ভ। এটি নিচে নেমে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।

পায়ের প্রধান ¯ায়ু সায়াটিক নার্ভ অনেক সময় রোগ ব্যাধির কারণে দুর্ব্বল হয়ে যায়। আবার ভিটামিনের অভাবেও ব্যাথা বেদনা অনুভুত হতে পারে। এ ধরনের রোগকে সায়াটিক রোগ বলে।

নালীবিহিন গ্রন্থি

নালী বিহিন গ্রন্থি হচ্ছে শরীরের সে সকল গ্রন্থি যাদের নিঃসৃত রস কোন নালী দিয়ে বের হয় না, প্রত্যক্ষভাবে র্েক্তর সাথে মিশে যায়। এ সব গ্রন্থি দিয়ে যে রস বের হয় তাদের হর্মোন বলে। দেহের উপর এদের অনেক প্রভাব আছে।

এই গ্রন্থিগুলো দেহের গঠন, বৃদ্ধি, পুষ্টি, যৌনতা, খাদ্যরস শোষণ ইত্যাদি নানা কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলোর যে কোন একটির নিঃসরন কম হলে দেহ রোগে আক্রান্ত হয়। তার জন্য

ঐ গ্রন্থির নির্য্যাস ইনজেকশন দিতে হয়। এই গ্রন্থিগুলো হচ্ছে-

১. পিটুটারী- এটি হলো সব গ্রন্থির রাজা, অর্থাৎ দেহের সব গ্রন্থির কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি মস্তিস্ক বা বেইন এর নিচে অবস্থিত। এর দুটি অংশ- সম্মুখভাগ ও পশ্চাদভাগ। এটি প্রসুতির দুগ্ধ যোগায়, যৌন গ্রন্থিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সন্তান প্রসবের পর রক্তপাত বন্ধ করে। এটি রক্তচাঁপ নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক।

২. থাইরয়েড গ্রন্থি- এটি গলনালীর দুই দিকে অবস্থিত। এটির নিয়ন্ত্রণ কম হলে দেহ ঠিকমত বর্ধিত ও পুষ্টিপ্রাপ্ত হয় না।

৩. প্যারা থাইরয়েড গ্রন্থি- এটি দেহের ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. এড্রিনাল গ্রন্থি- এই দুটি মুত্রাশয় বা ব্লাডারের মাথায় অবস্থিত। এই দুটি গ্রন্থির কাজ হচ্ছে দেহকে ক্ষয়ক্ষতি ও বিপরায়ের হাত থেকে রক্ষা করা। আবার এরা যৌনক্রিয়া, বিপাক হৃৎপিন্ড,ধমনী ইত্যাদির কাজকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

এছাড়াও এদের বহুবিধ ছোট ছোট কাজ আছে। শক হলে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স এর রস স্টরয়েডে দেয়া হয়। আবার হাঁপানি হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসনালীগুলোকে ডাইলেট করে থাকে ম্যাডালা রস অ্যাড্রিনালিন। এটি আকস্মিক হার্ট ফেল হবার অবস্থায়ও কাজ করে

৫. সেলস আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স- পেটের মধ্যকার ক্লোম বা সেলস আইলেটস্ গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন নামক এক ধরনের নির্য্যাস বের হয়। দেহে এই নির্য্যাস কম হলে, আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য থেকে উদ্ভুত গ্লুকোজ শরীরে শোষিত হয় না। ফলে এই গ্লুকোজ প্র¯াবের সাথে বের হয়ে যায় এবং শরীর দুর্ব্বল হয়ে পরে। এই রোগকেই বহুমুত্র বা ডায়াবেটিক বলে।

৬. যৌন গ্রন্থি- পুরুষের দুটি অন্ড, আর নারীর দুটি ডিম্বকোষ থেকে হর্মোন নিঃসৃত হয়। এই হর্মোন থেকেই সৃষ্টি হয় পুরুষের পুরুষত্ব এবং নারীর নারীত্ব। পুরুষের হর্মোনকে বলে টেস্টোস্টেরন আর নারীর হর্মোনকে বলে এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্ট্রোন। এছাড়া, থাইমাস ও পিনিয়াল নামে আরও দুটি গ্রন্থি আছে যারা দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই গ্রন্থিগুলো আকারে ক্ষুদ্র হলেও এদের কাজ বিরাট।

গলকক্ষ ও মুখগহ্বর

মুখের ভিতরে মাড়ি বা ফেনুলামের মধ্যে বসানো থাকে ১৬+১৬ = ৩২ টি দাঁত (পূর্ণ বয়স্ক)। উপরের দাঁতের পরে থাকে শক্ত অংশ বা হার্ড প্যালেট যা নরম অংশ বা সফট প্যালেটে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং ভিতরের দিকে গিয়ে নিচের পাটির সংগে যুক্ত হয়েছে। এই যুক্তস্থানেই থাকে জিহ্বার গোড়া, জিহবা দেখে কিছু কিছু রোগও র্নিণয় করা যায়। উপরের প্যালেটের শেষে হলো গলকক্ষের মুখ। মুখ গহ্বর ও গলকক্ষের যুক্ত অংশটির নাম ফ্যারিংক্স।

উপরের মুখগহ্বরের শেষভাগের মাঝখানে আছে আলজিভ বা বা ইভিউলা। এর দুপাশে আছে দুটি টনসিল গ্রন্থি। টনসিলে জীবানু আক্রান্ত হলে টনসিলাসাইটিস রোগ হয়। আর শিশুদের ডিপথেরিয়া রোগ হলে গলার ম্েরধ্য সাদা র্পদা পড়ে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। জিহ্বার পিছনে আরও ছোট ছোট গ্রন্থি থাকে যাদেরকে বলে টনসিল অব ট্যাং।

জিহ্বা

হাইঅয়েড বোন নামক গলার হাড়ের গলার হাড়ের সংগে আটকে থাকে জিহবা। এর উপরের অংশের নাম ডরসাম। এখানে অনেকগুলো টেস্টব্যাড আছে যা দিয়ে আমরা স্বাদ গ্রহণ করি। লালা নিঃসরনের জন্য জিহ্বার গোড়ারদিকে কতগুলো লালা গ্রন্থি থাকে। এগুলো হচ্ছে- (১) প্যারোটিড গ্রন্থি (২) সাবম্যাক্সিলারী গ্রন্থি (৩) সাব লিঙ্গুয়াল গ্রন্থি।

গলকক্ষের ভাগ

প্যালেট এর পরে নিচের দিকে গলকক্ষ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এক ভাগ সামনের দিকে স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনালীর সংগে যুক্ত। পেছনের ভাগ ফ্যারিংক্স ও অন্ননালীর সংগে যুক্ত।

খাবার সময় খাদ্য গিললে তার জন্য সামনের নালীর মুখটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে খাদ্য পেছন দিয়ে অন্ননালীতে প্রবেশ করে। আবার শ্বাস নেবার সময় বাতাস সামনের দিক দিয়ে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে। কিন্তু খাবার সময় কথা বললে বা শ্বাস নিলে, খাদ্য কণা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ তালু উঠা।

দাঁত

দাঁতের গোড়ার দিকে সুক্ষ্ম শিরা বা ধমনী আছে। দাঁতের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত একটি ক্যানেল থাকে যা পাল্প দিয়ে পূর্ণ থাকে। তিন ধরনের বস্তু দিয়ে দাঁত গঠিত। এ গুলো হচ্ছে-

১. ডেনটিন- দাঁতের বেশীর ভাগ অংশই এটি ।

২. এনামেল- এটি দাঁতের আগা বা উপরের অংশের আবরণ। দেহের সবচেয়ে শক্ত টিসু।

৩. সিমেনটাম- এটি দিয়ে দাঁতের গলা ও গোড়া তৈরী হয়। দাঁতের গোড়া ও সকেটের দেওয়ালের মধ্যে থাকে কিছু কানেক্টিভ টিসু। এর নাম পেরিসিমেন্টাম।

দাঁতের গোড়ায় ইনফেকশন হলে তা দাঁত ও মাড়িকে আক্রমণ করে এবং সেখানে পুঁজ জমে। ফলে দাঁত নড়তে থাকে এবং ব্যাথা অনুভুত হয়। একে বলে পায়োরিয়া রোগ।

নিয়মিত দাঁত পরিস্কার না করলে দাঁতের উপর খাদ্যকণা জমে এক ধরনের এসিড তৈরী করে। এই এসিড দাঁতকে ক্ষয় করতে থাকে এবং কালো রং ধারণ করে। একে বলে ক্যারিজ বা দন্তক্ষয় রোগ। আসলে দাঁতে কোন পোকা হয় না।

প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রতি পাটিতে ১৬ টি করে দাঁত থাকে। তার মধ্যে ইনসিসর ৪ টি, ক্যানাইন ২ টি, প্রিমোলার ৪ টি এবং মোলার ৬ টি। তৃতীয় মোলার সবার শেষে উঠে। একে বলে আক্কেল দাঁত বা উইসডম টুথ।

শিশুর প্রথমে যে দাঁত উঠে তাকে বলে দুধ দাঁত। এগুলো ৫-৭ বৎসরে উঠে যায়। তারপর যে দাত উঠে তাকে বলে পারমানেন্ট টিথ। শিশুদের মোট ২০ টি দাঁত থাকে। ২+১+০+২ = ৫। প্রতি পাটিতে দাঁত থাকে ৫+৫=১০ এবং ২ পাটিতে দাঁত থাকে ১০+১০=২০টি। শিশুদের প্রিমোলার থাকে না। বড়দের স্থায়ী দাঁত গুলো উঠে গেলে এগুলো আর পুনঃরায় জন্মায় না। তাই বাঁধানো ছাড়া আর উপায় থাকে না।

দাঁতের যতেœ নিয়মিত ব্রাশ করতে হবে। প্রচুর পরিমানে ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন সি খেতে হবে। টাটকা ফলমুল ও শাকসবজি খেতে হবে।

হার-২৫

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি

রোগ পরীক্ষার উপায়

সঠিক চিকিৎসার জন্য প্রথমেই রোগ নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরী। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে না পারলে চিকিৎসার কোন সুফল পাওয়া যাবে না। তাই প্রত্যেক চিকিৎসকেরই কর্তব্য খুব ঠান্ডা মাথায় রোগ পরীক্ষা করে রোগটিকে চিনে নেয়া। তারপর চিকিৎসা করা ও সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করা।

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস সারা জনমের রোগ। এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। ডায়াবেটিসের মূল লক্ষণগুলো হলো অতিরিক্ত পিপাসা, ঘন ঘন প্রস্রাব ।

১. আবার যদি এমন হয় দ্রুত ওজন হারাচ্ছে শরীর, হাঁটাচলা, ব্যায়াম কিছুই হচ্ছে না বা খাদ্য নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টা চলছে না, অযথা অকারণে ওজন কমছে, তাহলে রক্তের সুগার বেড়েও যেতে পারে।

২. বাড়তি ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ করেন।

৩. বারবার ছোট ছোট অসুখ হচ্ছে, যেমন- ঘন ঘন শরীরে ফোড়া হচ্ছে বা প্রস্রাবে সংক্রমণ হচ্ছে, জিহ্বায় সাদা সাদা ক্যানডিডার ।

৪. কোথাও সামান্য কাটাছেঁড়া বা ঘা হওয়ার পর তা দ্রুত শুকাচ্ছে না।

৫. পায়ে ঘা হওয়া বা পায়ের আঙুলের মাঝে ছত্রাকের আক্রমণ হচ্ছে।

৬. কারণে-অকারণে হাত-পা অবশ হয়ে আসছে বা ভারী ভারী লাগছে। এগুলোকে নিউরোপ্যাথি বলে, যার কারণ ডায়াবেটিস।

৭. প্রস্রাব করেন, সেখানে দেখা যায় পিঁপড়া আসছে।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. জামবীজ চুর্ণ - ১ গ্লাস পানিতে আধা চা চামুচ দৈনিক ২ বার ।

২. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।

৩. নিম চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

৪. খাবারে দৈনিক ১ চা চামুচ কালিজিরার তেল বিশেষভাবে উপকারী।

৫. তাছাড়া, রক্তচাপ থাকলে প্রেসার কিউর দিতে হবে। **হার-২৬**

অ্যাজমা

অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণযোগ্য অসুখ। শ্বাসকষ্ট এর অন্যতম লক্ষণ। এ ছাড়া আরো কিছু লক্ষণ রয়েছে। অ্যাজমা দুই ধরনের আছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, কার্ডিয়াল অ্যাজমা।

ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হলো শ্বাসনালির প্রদাহ। শ্বাসনালির প্রদাহের কারণে যে শ্বাসকষ্ট হয়, সেটি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা।

আর কার্ডিয়াক অ্যাজমা হলো একিউট লেফ্ট ভেন্টিকুলার ফেইলিউর। এটি হার্টের কারণে হয়। দুটো বিষয় দুটো পদ্ধতির কারণে হয়। হার্টের জন্য কার্ডিয়াক অ্যাজমা। ব্রঙ্কাসের জন্য ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা।

লক্ষণগুলো :

ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার ক্ষেত্রে প্রথমেই রোগীর শ্বাসকষ্ট থাকে। শ্বাসকষ্ট দুই রকম আছে। হঠাৎ করে বেশি শ্বাসকষ্ট হতে পারে। আবার কিছু কিছু শ্বাসকষ্ট আছে, তার সঙ্গে শুকনো কাশি থাকতে পারে। সাধারণত পরিবেশের কারণে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে, ভাইরাল ইনফেকশনের কারণে, ধুলা-বালি ও কুয়াশার কারণে, পানির অধিক ব্যবহারের কারণে, কিছু কিছু খাবারের কারণে এই অ্যাজমা হয়।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. এ্যাজমা কিউর - ১ চা চামুচ এ্যাজমা কিউর ১ চা চামুচ মধু মিশিয়ে চাটনির মত করে খেতে হবে- ৩ বেলা খাবারের পর। শীতকালে নাক-মাথা ঢেকে ঘুমাবেন। রাতে ২-৫ মিনিট হালকা আগুনের তাপ থেকে গরম নিঃশ্বাষ নাক দিয়ে নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়বেন। ধুলাবলি ও কুয়াশা নাক দিয়ে ঢুকতে দিবেন না।

২. নিম চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

৩. যে কোন খাবারের সাথে দৈনিক ১ চা চামুচ কালিজিরার তেলও বিশেষভাবে উপকারী।

৪. তাছাড়া, রক্তচাপ থাকলে প্রেসার কিউর দিতে হবে।

হার-২৭

কিডনি

কিডনি রোগের উপর্সগ বা ব্যথা

* কিডনিজনিত ব্যথা সাধারণত মেরুদন্ড থেকে একটু দূরে ডান বা বাম পাশে হয়। এটি পেছনের পাঁজরের নিচের অংশে অনুভূত হয়। এই ব্যথা নড়াচড়া করে এবং কোমরের দুই পাশেও যেতে পারে। এই ব্যথা থেকে থেকে আসে, শোয়া-বসা বা কোনো কিছুতেই আরাম মেলে না।

* কিডনির সমস্যায় ব্যথা মূল উপর্সগ নয়, এতে শরীরে পানি আসা, দুর্বলতা, অরুচি, বমির ভাব দেখা দেয়। জ্বর হতে পারে, প্রস্রাব ঘোলা দুর্গন্ধ বা রক্ত থাকতে পারে। প্রস্রাবের পরিমাণ কম-বেশি হয়। রক্ত শূন্যতা থাকতে পারে।

*কিডনি খারাপ হওয়ার পেছনে দীর্ঘদিনের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, সংক্রমণ, ব্যথানাশক বড়ি খাওয়া ইত্যাদির ইতিহাস থাকবে।

কিডনি ক্যানসার

কিডনি ক্যানসারকে রেনাল সেল কারসিনোমা বা আরসিসি বলা হয়। এটি ম্যালিগন্যান্ট ক্যানসার। কিডনি ক্যানসার ইউরিনিফেরাস টিউবল ইপিথেলিয়াম বা রেনাল প্যারেঙ্কিমার ভেতর থেকে শুরু হয়। লক্ষণ -

১. প্রস্রাবে রক্ত- প্রস্রাবে রক্ত যাওয়া আরসিসির অগ্রর্বতী পর্যায়।

২. কোমর ব্যথা- কোমর ব্যথা বা চাপ অনুভব এ সময় কিডনি একটু বড় হয়ে পাশে চাপ দিতে পারে। তাই ব্যথা অনুভব হয়।

৩. অবসন্নতা- দীর্ঘমেয়াদি অবসন্নতা কিডনি ক্যানসারের লক্ষণ।

৪. ওজন কমা- হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া ।

৫. রক্ত-সংক্রান্ত বিষয়- কিডনি ক্যানসার রক্তস্বল্পতা তৈরি করতে পারে, ইলেকট্রোলাইট ও ক্যালসিয়ামকে ভারসাম্যহীন করে ।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. কিডনী কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার ।

২. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে ।

৩. খাবারের সাথে দৈনিক ১ চা চামুচ কালিজিরার তেল উপকারী।

৪. তাছাড়া, ডায়াবেটিক থাকলে তাকে জামবীজ চুর্ণ ও নিম চিরতা, রক্তচাপ থাকলে প্রেসার কিউর দিতে হবে। **হার-২৮**

চোখ

চোখের সাধারণ সমস্যা

১. পাওয়ারজনিত সমস্যা প্রথম ও প্রধান।

২. চোখের পাতা একটা সমস্যা। চোখের পাতা ফুলে যেতে পারে। ব্যাথা হতে পারে। সামান্য একটু ব্যথার ওষুধ খেলে, গরম স্যাঁক দিলে এটি কমে যেতে পারে।

৩. সংক্রমণের পর্যায়ে চলে যায়। তখন একটি অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ দেওয়া লাগে সাত দিনের।

৪. কনজাংটিভাইটিস। চোখ ওঠা। চোখ লাল হয়ে যায়।
কনজাংটিভাইটিস কয়েক ধরনের হতে পারে- ব্যাকটেরিয়াল, ভাইরাল ও অ্যালার্জিক। ব্যাকটেরিয়াল যেটা হয়, এতে চোখ লাল হয়ে যেতে পারে। চোখে ব্যথা হতে পারে। চোখে ময়লা যেতে পারে। নিয়মমতো ড্রপ ব্যবহার করলে, পানি না লাগালে এবং অন্যদের সংস্পর্শে না গেলে, ৭ - ১০ দিনের মধ্যে এটি ভালো হয়।

৫. অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস। এটি অ্যালার্জেনের জন্য হয়। অ্যালার্জিক জাতীয় জিনিস এড়িয়ে যেতে হবে। যেমন : ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ, বেগুন, মিষ্টিকুমড়া, পুঁই শাক, বাড়ির ধুলাবালি যার যেটিতে অ্যালার্জি রয়েছে। শুধু ড্রপ আর ট্যাবলেট খেলেই হবে না। অ্যালার্জি এর ঔষধও খেতে হবে।

৬. কর্নিয়াতে আলসার হতে পারে, ক্যারাটাইটিস হতে পারে। কর্নিয়া স্বচ্ছ একটি পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। যদি ওই পর্দায় কোনোভাবে আঁচড় বা আঘাত লাগে, ছিলে যায়, তাতে আলসার হওয়ার আশঙ্কা। ফাঙ্গাল সংক্রমণ সাধারণত ধান মাড়াইয়ে যাঁরা কাজ করেন।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

২. মুছাব্বর মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।

৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

৪. ভিটামিন এ, ডি, ই, কে, ইত্যাদি নিয়মিত খেতে হবে।

পিত্তথলিতে পাথর

পিত্তথলির পাথর ছোট ছোট বালুর দানার মতো থেকে শুরু করে মটরের দানা বা তার চেয়েও বড় শক্ত দানাদার বস্তু যা বিভিন্ন রঙের ও আকৃতির হয়। কোলেস্টেরল, বিলিরবিন বা ক্যালসিয়াম ইত্যাদি পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি এই পাথরগুলো।

মোটা ও অধিক ওজনের ব্যক্তিদের পিত্তথলিতে পাথর বেশি হয়। নারীদের এই প্রবণতা বেশি। এ ছাড়া চল্লিশোর্ধ্ব বয়স, জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাবার অভ্যাস, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি এই ঝুঁকি বাড়ায়।

লক্ষণঃ পিত্তথলিতে পাথর হলে ব্যাথা বা কোলেসিস্টাইটিস হয়। ওপর পেটের ডানদিকে তীব্র ব্যথা হতে পারে। মিনিট খানেক হতে ঘন্টা খানেক স্থায়ী হতে পারে এই ব্যথা। পেটের পেছন দিকে, কাঁধে, পেটের মাঝ বরাবর এমনকি বুকের ভেতরও ছড়িয়ে পড়তে পারে ধীরে ধীরে। সেই সঙ্গে বমি ভাব বা বমি, হালকা জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ হয়। অনেক সময় পাথর পিত্তনালিতে আটকে যায় এবং বিলিরবিনের বিপাক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জন্ডিসও হতে পারে। রোগ নির্ণয়ের জন্য উপসর্গ, আলট্রাসনোগ্রামই, ইআরসিপি জাতীয় পরীক্ষা করা যেতে পারে।

চিকিৎসাঃ - প্রদাহ ও তীব্র ব্যথার সময় কোনো অস্ত্রোপচার করা হয় না। সাধারণত কয়েক দিনের জন্য মুখে খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দিয়ে স্যালাইন, অ্যান্টিবায়োটিক ও ব্যথানাশক ওষুধ দিয়ে প্রাথমিক উপশমের চেষ্টা হয়। পরে পিত্তথলি ফেলে দেওয়ার অস্ত্রোপচারটি সপ্তাহ দুয়েক পর বা দু-তিন মাস পর করলেও ক্ষতি নেই। পেট কেটে বা ফুটো করে দুভাবেই এই অস্ত্রোপচার করা যায়। তবে পিত্তনালিতে পাথর আটকে গিয়ে থাকলে ইআরসিপি যন্ত্রের সাহায্যে সেটি বের করে আনা।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. পিত্ত কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে। রাতে শোবার আগে।

২. মুছাব্বর মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।

৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

শীতে ঠান্ডায় কানে তালা

শীতে ঠান্ডা লেগে হাঁচি ও সর্দিকাশির সঙ্গে অনেক সময় কানে তালা লাগার ঘটনাও ঘটে। কানে তালা মানে কান বন্ধ হয়ে থাকা, কিছু না শোনা। ব্যথাও হতে পারে। এ বিষয়টি আবার একেবারে হালকাও নয়। এ থেকে মধ্যকর্ণে অর্থাৎ কানের পর্দার ভেতরের দিকে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। রোগ বেশি তীব্র হলে কানের পর্দা ফুটো হয়ে কান বেয়ে রক্তমিশ্রিত পানি বা পুঁজ পড়তে পারে।

কী করা উচিত?

এ রকম সমস্যা দেখা দিলে ব্যাথা কমানোর জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন-জাতীয় ওষুধ, প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করতে হয়। বয়স উপযোগী নাকের ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যথা কমাতে প্যারাসিটামল খাওয়া যেতে পারে।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

২. মুছাব্বর মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।

৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

৪. রাতে হালকা আগুনের তাপে ছ্যাঁক নিতে হবে।

শীতকালে পা ফাটা

শীতকালে যেকোনো মানুষেরই পা ফাটে। যাদের থাইরয়েডে সমস্যা আছে তাদের এমনিতেই ত্বক খুব শুষ্ক থাকে, একই কথা ডায়াবেটিসের রোগীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। যাদের সোরিয়াসিস, একজিমা বা কোনো চর্মরোগ আছে তাদের পায়ে সমস্যা বেশি হয়। বয়স্ক ব্যক্তিদের পা ফাটার সমস্যা বেশি। ঠান্ডার দিনে পা ঠিকমত না ঘামলে, পায়ের সঠিক আদ্রতা বজায় থাকে না। ফলে পা ফাটে।

এমতাবস্থায়, খুব ঠান্ডায় পায়ে মোজা পড়তে হবে। পা ধোয়ার পর একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিন। গোড়ালি ও তালুতে পেট্রোলিয়াম জেলি বা গ্লিসারিন মাখুন। সপ্তাহে এক দিন লেবুর রস মিশ্রিত হালকা গরম পানিতে পা ভিজিয়ে, ঘষে মৃত কোষ ফেলে দিন। তারপর পা মুছে পেট্রোলিয়াম জেলি বা গ্লিসারিন মাখুন।

পা-ফাটার জন্য হারবাল চিকিৎসাঃ

১. ক্রাক কিউর দিনে ২-৩ বার ব্যবহারে পা ফাটা দুর করে।

২. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

৩. ভিটামিন মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে আধা চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

সাইনাস সমস্যা

একটু ঠান্ডা লাগলেই নাক বন্ধ বা নাক দিয়ে অবিরত পানি পড়া, সঙ্গে বিরক্তিকর মাথাব্যথা সাইনোসাইটিসের সাধারণ উপসর্গ। মুখমন্ডল ও মস্তিষ্কের হাড়ে কিছু ফাঁপা জায়গা আছে, যার নাম সাইনাস। এই ফাঁপা অংশটিতে প্রদাহের সৃষ্টি হলে তাকে সাইনোসাইটিস বলে।

সাধারণত ব্যাকটেরিয়া বা নানা ধরনের জীবাণুর আক্রমণেই সাইনোসাইটিস হয়। তবে নাকে আঘাত পাওয়া, অ্যালার্জি, ঠান্ডা লাগা, ধুলা-বালু, নাকে টিউমার ইত্যাদি সমস্যা এ রোগের ঝুঁকি অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

২. মুছাব্বর মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।

৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

৪. রাতে হালকা আগুনের তাপে ছ্যাঁক নিতে হবে।

চোখে ছানি পড়া

অন্ধত্বের প্রধান কারণ চোখে ছানি পড়া। সাধারণ মানুষ ছানিকে চোখে পর্দা পড়া বলে জানে। এটি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের ভেতরে অবস্থিত স্বচ্ছ প্রাকৃতিক লেন্সটি দিনে দিনে ঘোলা হতে থাকে। একেই বলা হয় ছানি পড়া বা ক্যাটারেক্ট। ছানি পড়ার কারণে দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে কমে যায়। ছানি যে কোনো বয়সেই হতে পারে। ডায়াবেটিসের রোগীদের ছানি অপেক্ষাকৃত কম বয়সে পড়ে এবং হারও বেশি। গর্ভকালে মায়ের হাম বা জার্মান মিজলস সংক্রমণ হলে বা মায়ের অপুষ্টি ও অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকলে শিশু জন্মগত ছানি নিয়ে জন্মাতে পারে। বয়োবৃদ্ধি, চোখে আঘাত, প্রদাহ, দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ ব্যবহার ইত্যাদি কারণে ছানি হতে পারে।

ছানি পড়লে, চোখের দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে কমে আসবে, কোনো কিছু চোখে আবছা বা ঝাপসা দেখা যাবে, চোখের কালো মণি বাইরে থেকে ধূসর বা সাদা দেখা যাবে, ছানির একমাত্র চিকিৎসা হলো অস্ত্রোপচার।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. প্রাথমিক অবস্থায়, ছানি কিউর দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে সুফল হয়।
২. সহায়ক হিসাবে ত্রিফলা, ভিটামিন এ-ডি, ক্যালসিয়াম, বেল চুর্ন
৩. ডায়াবেটিকের কারণে ছানি পড়লে, সাথে জামবীজ চুর্ণ ও নিম চিরতা

চোখে অঞ্জনি

চোখের পাপড়ি যেখান থেকে বের হয়, সেই রেখা ঘেঁষে যে লাল ছোট্ট দানা বা পুঁটুলি মাঝে মাঝে তৈরি হয়, তাকে চলতি কথায় অঞ্জনি বলে। চোখের পানি তৈরি করে এমন একটি গ্রন্থি হলো মেবোমিয়ান গ্রন্থি। এই গ্রন্থির মুখ বন্ধ হয়ে গিয়ে ভেতরে ময়লা জমা হয় এবং প্রদাহ বা সংক্রমণ থেকে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অঞ্জনি এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায় ও ভেতরের ময়লা বের হয়ে আসে। চিকিৎসা খুবই সাধারণ। এক টুকরো তুলোর বল বা কাপড়ের বল গরম পানিতে ভিজিয়ে দিনে অন্তত: চারবার সেঁক দিতে হবে। প্রয়োজন হলে অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগানো যেতে পারে। বরিক পাউডারের সেঁক বেশ জনপ্রিয়।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
২. মুছাব্বর মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।
৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার ।
৪. অ্যান্টিবায়োটিক মলম। দিনে ২ -৩ বার ব্যবহার্য্য।

হাঁটুব্যথা

বয়স হলে হাঁটুব্যথা নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। বসা থেকে উঠতে, সিঁড়ি ভাঙতে বা নামাজ পড়তে গিয়ে যখন-তখন হাঁটু দুটো টন টন করে ওঠে। কখনো শব্দও করে। এই হাঁটুব্যথা সব সময় চিকিৎসা করেও পুরোপুরি সারিয়ে তোলা যায় না, কেবল খানিকটা কমিয়ে রাখা যায়।

আঘাতজনিত ব্যথা, ব্যথা এবং ফুলে যাওয়া, বয়সজনিত হাঁটুব্যথা ইত্যাদি দেখা দেয়।

অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ করুন ও স্বাভাবিক ওজন বজায় রাখুন। হাঁটু ভাঁজ করে কাজ করবেন না, মেঝেতে, পিঁড়িতে বা নিচু মোড়া জাতীয় আসনে বসবেন না। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবেন না। উঁচু কমোড ব্যবহার করুন। ভারী বস্তু বহন করবেন না। পেশির ব্যায়াম শিখে নিন। দিনে দুই-তিনবার গরম ছ্যাঁক নিতে পারেন। ব্যথার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ফিজিওথেরাপি নিতে পারেন।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
২. মুছাব্বর মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।
৩. ক্যালসিয়াম মিশ্র - ১ গ্লাস পানিতে আধা চা চামুচ। দিনে ২ বার।
(রক্ত শুন্যতা থাকলে সাথে আয়রণ মিশ্র দিতে হবে।)
৪. রাতে হালকা আগুনের তাপে ছ্যাঁক নিতে হবে।

হার্ট অ্যাটাক

হার্ট অ্যাটাকের প্রধান ও সাধারণ লক্ষণ হলো বুকে ব্যথা। এই ব্যথা বুকের মাঝখানে বা বাঁ পাশে শুরু হয় এবং ক্রমেই বাঁ হাত, গলা বা চোয়ালে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যথার ধরনটিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চাপ দিয়ে ধরে রাখা বা বুকটা দুমড়ে মুচড়ে যাবার মত। সঙ্গে ঘাম হবে প্রচুর।

বুকে ব্যথা ছাড়াও হঠাৎ শুরু হওয়া শ্বাসকষ্ট, ভীষণ দুর্বলতা বা অস্বাভাবিক ক্লান্তি, পেটের ওপর দিকে বা পেছনে ব্যথা, গ্যাস্ট্রিক বা বদহজমের মতো অনুভূতি, বমি ভাব বা বমি, মাথা ঝিমঝিম করা, মাথা হালকা হয়ে যাওয়া, হৃৎস্পন্দনে বা নাড়ীর গতিতে অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি। পরিবারে হার্ট অ্যাটাকের ইতিহাস, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও রক্তে উচ্চমাত্রার চর্বি আছে এমন ব্যক্তি, ওজনাধিক্য, ধূমপায়ী ব্যক্তিরা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকির মধ্যে আছেন।

দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিসের কারণে দেহের সিমপ্যাথেটিক ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগস্থ হয়। ফলে স্নায়ুতন্ত্র সর্তকসংকেত অনুযায়ী সাড়া দিতে ব্যর্থ হয় এবং তেমন কোনো উপর্সগই হয় না। একে বলে নীরব হার্ট অ্যাটাক।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. হার্ট কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।

২. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার ।
৩. আয়রণ মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে আধা চা চামুচ। দিনে ২ বার।

কোমর ব্যথা

* বেশির ভাগ কোমর ব্যথা সাধারণত মাংসপেশি, মেরুদন্ডের হাড়, ডিস্ক, সন্ধি ও স্নায়ুসম্পর্কিত।
* এটি নির্দিষ্ট অংশ জুড়ে হয়।
* মেরুদন্ডের নড়াচড়া যেমন ওঠাবসা, সামনে ঝোঁকা, হাঁটা বা দাঁড়ানো, অনেকক্ষণ ধরে কাজ করা বা শুয়ে থাকার সঙ্গে এই ব্যথা বাড়ে-কমে।
* সাধারণত জ্বর হয় না (তবে টিউমার, টিবি ইত্যাদি ছাড়া)। দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা, অরুচি, বমির ভাব ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সমস্যা সাধারণত থাকে না।
* সাধারণত বিশ্রাম ও ব্যথানাশক ওষুধ সেবনে ভালো হয়; বন্ধ করলে ব্যথা আবার ফিরে আসে।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
২. মুছাব্বর মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।
৩. ক্যালসিয়াম মিশ্র - ১ গ্লাস পানিতে আধা চা চামুচ। দিনে ২ বার।
(রক্ত শুন্যতা থাকলে সাথে আয়রণ মিশ্র দিতে হবে।)
৪. রাতে হালকা আগুনের তাপে ছ্যাঁক নিতে হবে।

ছুলি থেকে মুক্তির উপায়

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ‘ছুলি’, ‘ছইদ’ বা ‘কদম’ ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত চর্মরোগটিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলা হয় টিনিয়া ভারসিকল। এটি এক প্রকার ছত্রাকের সংক্রমণ। এ রোগে ঘাড়ে, বুকে, পিঠে ও শরীরের অন্যান্য উন্মুক্ত অংশে সাদা বা বাদামি গাঢ় বা হালকা ছোট ছোট দাগের মতো হয়।

স্যাঁতসেঁতে ও গরম আবহাওয়ায় এ ছত্রাকের আক্রমণ বেশি হয়। দেহের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে গেলে, স্টেরয়েড ট্যাবলেট সেবনেও ছুলি হতে পারে। অনেকে যেখানে একত্রে থাকে, জিনিসপত্র ব্যবহার করে, সেখানে এই ছত্রাকের সংক্রমণ দ্রুত ছড়ায়। যেমন: মেস, ব্যারাকে, ডরমিটরি, হোস্টেল ইত্যাদিতে।

পরিবারের একজনের ছুলি হলে অন্য সদস্যরাও আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের আক্রমণ এড়াতে , স্যাঁতসেঁতে আর্দ্র আবহাওয়ায় পরিচ্ছন্ন থাকুন। শরীরের যেসব স্থানে ঘাম বেশি হয় সেসব স্থান বারবার ধুয়ে পরিষ্কার ও শুকনো রাখুন। গরমের দিন রোজ একবার বা দুবার গোসল করুন। ঘামে ভেজা পোশাক না ধুয়ে আর ব্যবহার করবেন না। অন্যের ব্যবহৃত কাপড় ব্যবহার করবেন না। একাধিক ব্যক্তি কখনো একই ক্ষুরে মাথা বা দাঁড়ি কামাবেন না।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
২. ছইদ কিউর- দৈনিক ৩ বার মাখতে হবে।
৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার ।

হাড় মজবুত রাখার উপায়

হাড়ের মূল উপাদান আমিষ, কোলাজেন ও ক্যালসিয়াম। প্রাকৃতিক নিয়মেই ৩০ বছরের পর থেকে হাড়ের ঘনত্ব ও পরিমাণ কমতে থাকে, হাড় দুর্বল ও ভঙ্গুর হতে থাকে। ৫০ থেকে ৬০ বছরের দিকে হাড় অনেক দুর্বল হয়ে যায়। তাই সামান্য আঘাতেও বয়স্ক মানুষের কটি, পাঁজর ও কবজির হাড় ভেঙে যেতে পারে।

৪০ শতাংশ হাড়ের ঘনত্ব বংশানুক্রমিক তাই পরিবারে হাড় ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা থাকলে ঝুঁকিটা বেশি। ২০ শতাংশ হাড়ের ঘনত্ব নির্ধারিত হয় জীবনযাত্রার মাধ্যমে। শৈশব থেকে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম, খনিজ ও আমিষসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ধুমপান ও মদ্যপান বর্জন, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা এবং কর্মক্ষম থাকা হাড়ের সুস্থতার জন্য দরকারি।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
২. মুছাব্বর মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।
৩. ক্যালসিয়াম মিশ্র - ১ গ্লাস পানিতে আধা চা চামুচ। দিনে ২ বার।
(রক্ত শুন্যতা থাকলে সাথে আয়রণ মিশ্র দিতে হবে।)

একজিমার কারণ

একজিমা এক ধরনের চর্মরোগ। এটি সাধারণত পরিবারের থেকে, অ্যাজমা কিংবা অ্যালার্জির কারণে. সব সময় সর্দি থাকলে.

রোগীর সংস্পর্শে এলে বা রোগীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ব্যবহার করলে হতে পারে। মুখে, গলায়, বুকে, পিঠে, হাতের কবজি এবং হাঁটু ও কনুইয়ের ভাঁজে সাধারণত একজিমা হয়।

লক্ষণ- আক্রান্ত স্থান লাল হবে এবং কিছু ফুসকুড়ি দেখা দেবে। কখনও রস নিঃসৃত হতে পারে। স্থানটি চুলকাবে, চুলকানি তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। আক্রান্ত স্থানটির চামড়া শুষ্ক হবে এবং অমসৃণ হয়। দুধ, ডিম ও নারকেল খেলে কারও কারও বাড়ে। আক্রান্ত স্থানটি পরিস্কার রাখতে হবে। সাবান ব্যবহার করা নিষেধ।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
২. মুছাব্বর মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।
৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার ।
৪. এক্সি কিউর- স্থানটি পানিতে ধুয়ে, মুছে, শুকিয়ে হালকা ব্যবহার্য্য।

চুলকানি / বাত / এলার্জি

স্ক্যাবিস রোগটি চুলকানি নামে পরিচিত। এটি ছোঁয়াচে রোগ। পর-জীবীর আক্রমণে এ রোগ হয়। বাড়িতে একজন আক্রান্ত হলে অন্য সদস্যরাও আক্রান্ত হতে পারে। যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কম থাকে, তাদের বেশি হয়। স্পর্শের মাধ্যমে সাধারণত এ রোগ ছড়ায়। রোগীর ব্যবহৃত কাপড়, গামছা, চাদর ও বালিশ ব্যবহারে এ রোগ হতে পারে।

লক্ষণ: সারা শরীর চুলকায়, আঙুলের ফাঁকে, নিতম্বে, যৌনাঙ্গে, হাতের তালু, কবজিতে, বগল ও নাভি এবং কনুইয়ে চুলকানি শুরু হয় এবং পরে এ স্থানগুলোতেই সমস্যা বেশি থাকে। চুলকানি রাতে বাড়ে।

বাত ও এলার্জিঃ এটি কোন ছোঁয়াচে রোগ নয়। চিকিৎসাও ভাল। এবং একই ঔষধ চুলকানি, বাত, এলার্জি তিন ক্ষেত্রেই কাজ করে।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
২. মুছাব্বর মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।
৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার ।

শুধু চুলকানির ক্ষেত্রে ঔষধের সাথে মলমও সুফলদায়ক। **হার-৩৭**

ব্রণ থেকে মুক্তি পাবার উপায়

ব্রণ বা অ্যাকনি ত্বকের তেলগ্রন্থি বা সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ডের একটি প্রদাহজনিত রোগ। ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সে দেহে নানা হরমোনের ওঠানামার কারণে ব্রণ বেশি হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনিতেই সেরে যায়। তবে প্রাপ্তবয়স্করাও ব্রণের ঝামেলায় ভোগেন। ব্রণের কারণ বংশগত বা জেনেটিক, হরমোনজনিত জটিলতা, অ্যান্ড্রোজেনের প্রভাব, প্রসাধনী-ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, জীবাণুর আক্রমণ, মানসিক চাপ। ব্রণ হলে সাধারণত চুলকানি থাকে না। তবে ব্যথা হতে পারে। গর্ভবতী নারী প্রথম তিন মাস কোনো ধরনের ওষুধ না খাওয়াই ভালো।

ব্রণ হলে মুখের ত্বক খোঁটা উচিত নয়, এতে ত্বকে দাগ পড়ে যাবে। সব সময় ত্বক পরিষ্কার রাখতে হবে। অতিরিক্ত তেলজাতীয় খাবার বা ভাজা পোড়া এড়িয়ে চলতে হবে। যেকোনো প্রসাধনসামগ্রী ব্যবহারের আগে সাবধান হওয়া উচিত।

ব্রণ সারাতে খনিজ লবণের মধ্যে জিঙ্ক, ভিটামিন ই এবং ভিটামিন বি৬ ভালো কাজ করে। খেতে হবে শস্যজাতীয় খাবার, শাক-সবজি, মাছ, গরুর কলিজা, মসুর ডাল,পনির, গরুর দুধ, কর্নফ্লেকস, ডিম, তেল, মুলাজাতীয় সবজি, তৈলবীজ, বাদাম, সবুজ সবজি ইত্যাদি।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।
২. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
৩. মধুর আরক- ১ কাপ পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।
৪. প্রতিদিন ২ বার ফেস কিউর ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের ৩০- ৪০ মিনিট পর পানি ও সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে।

মেছতা সমস্যা

মুখে, থুতনিতে, কপালে ও গালের অনেকখানি স্থান জুড়ে হালকা বাদামি, কালো বা লালচে দাগ হয়। এটি মেছতা নামে পরিচিত। ত্বকের রঞ্জক পর্দার্থ মেলানিনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াই এর কারণ। ক্রমান্বয়ে এটি বাড়তে থাকে। ২০ থেকে ৫০ বছর নারীদের মধ্যে এটি বেশী দেখা যায়। **হার-৩৮**

কোষ্ঠ্যকাঠিন্য এর মুল কারণ। দীর্ঘ সময় রোদে বা রান্নাঘরের তাপে কাজ করলেও এটি হয়। গর্ভবতী নারীদের হরমোনের মাত্রার ওঠানামা, জন্মনিয়ন্ত্রণবাড়ি বা বংশগত কারণেও হতে পারে।

মেছতার চিকিৎসা বেশ জটিল। তবে প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা সুফলদায়ক। রোদে বের হলে অবশ্যই সানব্লক ব্যবহার করা উচিত। ২% হাইড্রোকুইনোন ত্বকে দুই বেলা লাগালে উপকার হতে পারে। ট্রেটিনয়েন, গ্লাইকোলিক অ্যাসিড, কোজিক অ্যাসিড ইত্যাদিও ভাল কাজ করে। তবে মেছতা বারবার হয়। তাই কারণগুলোর বিষয়ে বেশি জোর দিতে হবে।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে
২. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
৩. মধুর আরক- ১ কাপ পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।
৪. প্রতিদিন ২ বার ফেস কিউর ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের ৩০-৪০ মিনিট পর পানি ও সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে।

মুখে ঘা মারাত্মক কোনো রোগ নয়

মুখের ভেতরের ঝিল্লি আবরণ কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে মুখে ছোট ছোট দানার মতো ঘা দেখা দেয়। মুখের পরিচ্ছন্নতা কম থাকলে, নানা ধরনের ভাইরাস বা ছত্রাকের সংক্রমণ, ভিটামিনের অভাব, বিভিন্ন ওষুধের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি কারণে মুখে ঘা হতে পারে। বিশেষ কোনো ভিটামিনের স্বল্পতা, দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, মানসিক অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে হতে পারে।

প্রচুর পানি পান করুন। লবণ-পানি দিয়ে বারবার কুলি করুন। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, রিবোফ্লেভিন ইত্যাদি ঔষধ খেতে পারেন। হারবাল চিকিৎসাঃ কম্বাইন্ড ভিটামিন ভাল কাজ করে। ২ বেলা ত্রিফলা।

প্রোস্টেট বড় হওয়া মানেই ক্যানসার নয়

পুরুষের মূত্রথলির ঠিক নিচে থাকে প্রোস্টেট গ্রন্থি। বয়সের সঙ্গে এই গ্রন্থি আকারে বড় হয়, বিশেষ করে ৫০ বছরের বেশি বয়সে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিরীহ ধরনের, অর্থাৎ ক্যানসার বা ম্যালিগন্যান্ট নয়। তবে ৫০ বছরের পর পুরুষদের **হার-৩৯**

প্রোস্টেটে ক্যানসার, প্রদাহ ইত্যাদির ঝুঁকিও বেড়ে যায় বলে সর্তক থাকাই ভালো। প্রোস্টেট গ্রন্থি স্বাভাবিকের চেয়ে বড় হওয়াকে বলে 'হাইপারট্রফি' এবং এই রোগকে বলে বিনাইন এনলারজমেন্ট অব প্রোস্টেট বা সংক্ষেপে বিইপি।

প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা বা প্রস্রাব ধরে রাখতে না পারা এর প্রধান লক্ষণ। এ ছাড়া প্রস্রাবের ধারা দুর্বল হওয়া, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাব একবারে পরিষ্কার না হওয়ার দরুন রাতে বারবার ওঠা, ইতস্তত ভাব, প্রস্রাবের ধারা একবার বন্ধ হওয়া এবং আবার শুরু হওয়া ।

চিকিৎসাঃ

প্রথম দিকে প্রস্রাবের ধারা মুক্ত রাখতে বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করা হয়, যেমন- ইউরি কিউর। সাথে- ত্রিফলা ও বেলচুর্ণ, আখের রস, ডাবের পানি। হারবাল চিকিৎসাঃ

১. প্রস্টেট কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।
২. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

প্রস্রাবের রং লাল!

অনেক সময় রঙের পরিবর্তন ছাড়াও প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যেতে পারে। রক্ত ছাড়াও অন্য কোনো কারণে, যেমন ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় প্রস্রাবের রং লালচে হতে পারে। বিটরুট-জাতীয় সবজি বেশি খেলে বা অতিরিক্ত ব্যায়াম করলেও প্রস্রাব লালচে দেখায়। যক্ষ্মার ওষুধ এবং আরও কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন সিপ্রোফ্লক্সাসিন, সেফালোস্পোরিন বা নাইট্রোফুরানটয়েন-জাতীয় ওষুধ প্রস্রাবের রং পরিবর্তন করে। এগুলো নির্দোষ হলেও ব্যথানাশক বা রক্ত তরল করার ওষুধ ওয়ারফেরিন খাওয়ার পর প্রস্রাবে রক্তপাত ঘটতে পারে।

কিডনি নিয়ে চিন্তা। প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপাতের প্রধান কারণ হচ্ছে কিডনি থেকে মূত্রনালি পর্যন্ত যেকোনো স্থানে প্রদাহ, সংক্রমণ, পাথর বা ক্যানসার। প্রদাহ বা সংক্রমণ হলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, তলপেটে ব্যথা, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া ও ব্যথা ইত্যাদি থাকবে। কিডনি বা মূত্রনালিতে পাথর হলে থেকে থেকে তীব্র ব্যথা হতে পারে, যা পেটের পেছন থেকে ধীরে ধীরে মুচড়ে নিচে নেমে আসে । **হার-৪০**

কোনো রকম ব্যথা না থাকলে মূত্রতন্ত্রের যক্ষ্মা সংক্রমণে প্রস্রাবে রক্ত যায়। পুরুষের প্রস্টেট গ্রন্থির সমস্যায়ও প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপাত হতে পারে। তীব্র ব্যথার কারণে পাথর সন্দেহ হলে একটি সাধারণ এক্স-রে বা আলট্রাসনোগ্রামেই ধরা পড়ার কথা।

এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ইউরোলোজিস্ট এর কাছে যেতে হবে।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. প্রস্টেট কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।
২. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।

পেট সমস্যাঃ কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাপা, পেট ব্যাথা, গ্যাস্ট্রিক, পাতলা পায়খানা, ক্ষুদামন্দা

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।
২. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
৩. বেলচুর্ণ- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
৪. মধুর আরক- ১ কাপ পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।

গ্যাস্ট্রিক আলসার বা পেপটিক আলসার

পরিপাকতন্ত্রের ঘা গ্যাস্ট্রিক আলসার বা পেপটিক আলসার নামে পরিচিত। পাকস্থলী ছাড়াও এটি পরিপাকতন্ত্রের যেকোনো অংশেই হতে পারে। সাধারণ অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিক দিনে দিনে জটিল হয়ে প্রথমে আলসার ও পরে আরও জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে।

সাধারণত পেটের উপরিভাগের মাঝখানে বক্ষপিঞ্জরের ঠিক নিচে পেপটিক আলসারের ব্যথা অনুভূত হয়। ব্যথাটা পেছনের দিকেও যেতে পারে। ক্ষুর্ধাত হলে ব্যথা বাড়ে এবং খাবার খেলে ব্যথা কিছুটা কমে। অনেক সময় রাতে পেটব্যথার কারণে রোগী ঘুম থেকে জেগে ওঠে। কিছু খেলে ব্যথা কমে যায়।

পেপটিক আলসারের ব্যথা সব সময় থাকে না। একাধারে ব্যথা কয়েক সপ্তাহ চলতে থাকে। এ ছাড়া বুক জ্বালা, অরুচি, বমি ভাব, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি উপসর্গ থাকে।

পেপটিক আলসারের ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার জরুরি নয়। তবে পরিপাক নালির কোনো অংশ সরু হয়ে গেলে অস্ত্রোপচারের দরকার হতে পারে। এ ক্ষেত্রে রোগীর বারবার বমি হতে পারে। প্রচুর বমি থেকে লবণ ও পানিশূন্যতা হতে পারে। পায়খানার সঙ্গে রক্ত গেলেও রক্তশূন্যতা হতে পারে।

নিরাময় পেতে ধূমপান বন্ধ করুন। ব্যথানাশক ওষুধ সেবন থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকুন। খাদ্যগ্রহণে শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। সাধারণত অ্যাসিড নিঃসরণ রোধকারী ওষুধ সেবনে উপকার হয়।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।
২. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
৩. বেলচুর্ণ- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

যকৃতে বা লিভারে চর্বি

শরীরে চর্বি বিপাকপ্রক্রিয়ার অসামঞ্জস্য এবং ইনসুলিন অকার্যকারিতার জন্য যকৃতের কোষগুলোতে অস্বাভাবিক চর্বি, বিশেষ করে ট্রাইগ্লিসা-রাইড জমে। এতে যকৃতের ওজন হিসেবে ৫ থেকে ১০ শতাংশ চর্বির পরিমাণ বেড়ে যায়। অ্যালকোহল সেবনকারী এবং স্থূল ব্যক্তিদের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৭৫ শতাংশ। অ্যালকোহলজনিত এবং অন্যান্য কারণজনিতও হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই, সাধারণ চর্বি জমা থেকে শুরু করে রোগটি নানা জটিল ধাপে অগ্রসর হতে পারে, যেমন: যকৃতের প্রদাহ, যকৃতের প্রদাহজনিত ক্ষত বা সিরোসিস, যকৃতের অকার্যকারিতা ইত্যাদি। অ্যালকোহলজনিত কারণে এ থেকে যে সিরোসিস হয়, তাতে ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

কারা ঝুঁকিতে আছেন?

১. যারা বেশি অ্যালকোহল সেবন করেন।
২. টাইপ ২ ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, রক্তে

কোলেস্টেরল বা চর্বির আধিক্য, স্থূলতায় আক্রান্ত ব্যক্তি।
৩. পাকস্থলি ও পরিপাকতন্ত্রে অস্ত্রোপচারজনিত, অপুষ্টি, ওজন হ্রাস।
৪. যকৃতের উইলসন্স ডিজিস, পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহ, হেপাটাইটিস সি
৫. ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় চর্বি জমে; যেমন: স্টেরয়েড, এমিওডেরন, মিথোট্রেক্সেট, টেট্রাসাইক্লিন, কিছু অ্যান্টি-ভাইরাস ইত্যাদি।
৬. ক্ষতিকারক বিভিন্ন রাসায়নিক, যেমন ফসফরাস, কীটনাশক, বিষাক্ত মাশরুম ইত্যাদি ব্যবহারকারীগণ ঝুঁকিতে আছেন?

রোগনির্ণয় ও প্রতিকার:

কোনো কারণে পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়ে। পেটের একটি আলট্রা-সাউন্ডের মাধ্যমে যকৃতের চর্বি সহজেই শনাক্ত করা যায়। টিস্যু পরী-ক্ষার মাধ্যমে কখনো রোগের শ্রেণী ও ধাপ নির্ণয় করা হয়। যকৃতে চর্বি জমার ঝুঁকি ও কারণগুলোকে প্রতিরোধের মাধ্যমেই কেবল প্রতিকার।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. ফ্যাট কিউর- রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।
২. লিভার কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।
৩. ত্রিফলা - ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।
৪. তাছাড়া, যে কোন খাবারের সাথে দৈনিক ১ চা চামুচ কালিজিরার তেল বিশেষভাবে উপকারী।

হাড় ক্ষয় সমস্যা

শরীরের ৯৯ শতাংশ ক্যালসিয়াম জমা থাকে হাড়ে। হাড়ের ঘনত্ব ও জোর অনেকটাই নির্ভর করে এই ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ও ঘনত্বের ওপর। হাড়ের গুরুত্বপূর্ণ এই উপাদান ক্ষয় বা কমে যাওয়ার কারণে হাড় ভঙ্গুর ও হালকা হয়ে যায়। এমন সমস্যাকে বলে অস্টিওপোরোসিস।

দেহে হাড়ের বৃদ্ধি ও গঠন জন্মের পর থেকে একটানা ২৫-৩০ বছর বয়স পর্যন্ত চলে। নারীদের মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হাড়ের ঘনত্ব মারাত্মকভাবে কমে যায়। নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই বার্ধক্য একটি বড় ঝুঁকি। এ ছাড়া কিছু হরমোনজনিত সমস্যা, বিভিন্ন ধরনের বাত, অত্যধিক মদ্যপান, অলস ও প্রায় শয্যাশায়ী জীবনযাপন,

এমনকি বিষণ্নতা এ রোগের ঝুঁকি অনেকাংশে বাড়িয়ে দিতে পারে।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. ক্যালসিয়াম মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে আধা চা চামুচ দৈনিক ২ বার। রক্তশুণ্যতা থাকলে আয়রণ মিশ্র সহ।
২. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।
৩. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

শীতের সাত অসুখ

১. নাকের অ্যালার্জি: এটি অ্যালার্জিজনিত নাকের প্রদাহ। ধুলাবালি, ঠান্ডা-গরমসহ বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি উদ্রেককারী উপাদান এর কারণ

২. নাক দিয়ে রক্ত পড়া: এর অনেক কারণ আছে। ছোটদের ক্ষেত্রে নাক খোঁটার কারণে , বড়দের ক্ষেত্রে উচ্চরক্তচাপের কারণে নাক দিয়ে রক্ত ঝরে। শীতে নাকের ভেতরটা শুকিয়ে চামড়া উঠে যায় এবং তখন নাকের ঝিল্লি ছিঁড়ে গিয়ে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে।

৩. নাকের পলিপ: সাধারণত দীর্ঘদিন নাকে অ্যালার্জি থাকলে এমনটি হয়ে থাকে। নাকের মধ্যে মিউকাস ঝিল্লিগুলো ফুলে আঙুরের দানার মতো বিভিন্ন আয়তনের হয়। নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে সাইনাসের ইনফেকশন হয়ে মাথাব্যথা হতে পারে।

৪. সাইনাসের ইনফেকশন: সাধারণত নাকে অ্যালার্জি ও পলিপ, নাকের হাড় বাঁকা ইত্যাদি কারণে নাকের দুই পাশের ম্যাক্সিলারি সাইনাসে ইনফেকশন হয়। এ ক্ষেত্রে মাথাব্যথাই মূল উপসর্গ। শীতে বারবার নাকের মধ্যে ব্যথা হয়, নাক বন্ধ থাকে।

৫. মধ্যকর্ণে প্রদাহ: শিশুদের বেশি হয়ে থাকে। সাধারণত উর্ধ্ব শ্বাসনালির প্রদাহ, টনসিলের ইনফেকশন, এডিনয়েড নামক গুচ্ছ লসিকা গ্রন্থির বৃদ্ধি ইত্যাদি থেকে এই ইনফেকশন হয়। কানে বেশ ব্যথা হয়, কান বন্ধ মনে হয়। চিকিৎসা না করলে রোগটি কানপাকা রোগে রূপ নিতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক ও নাকের ড্রপসহ অন্যান্য ওষুধ হচ্ছে এই রোগের চিকিৎসা।

৬. মধ্যকর্ণে পানির মতো তরল জমা: এই রোগের কারণও উপসর্গ অনেকটা মধ্যকর্ণে প্রদাহের মতোই। দীর্ঘদিন ধরে নাক

দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরার এটি হয়। শীতে এর প্রকোপ বাড়ে। কানের মধ্যে ফরফর শব্দ করে। সাধারণ ওষুধেই এ রোগ সারে।

৭. এডিনয়েড ও টনসিলের ইনফেকশন:টনসিলের সমস্যায় গলাব্যথা খেতে গেলে ব্যথা, সামান্য জ্বর থাকে। প্রথম ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। বারবার হতে থাকলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

নাক, কান ও গলার এই সাতটি অসুখের ঝামেলা এড়াতে শীত থেকে রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ করে শীতবস্ত্র-গলাবন্ধনী, মাথা ঢেকে রাখা, হাত-পায়ে মোজা পরা, ঠান্ডা এড়িয়ে চলতে হবে। সেই সঙ্গে সকালে হাত-মুখ ধোয়া এবং গোসলে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে হবে। এই সাতটি সমস্যার ক্ষেত্রে হারবাল চিকিৎসাও ফলদায়ক-

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
২. মুছাব্বর মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।
৩. ক্যালসিয়াম ও আয়রণ- ১ গ্লাস পানিতে আধা চামুচ দৈনিক ২ বার
৪. তাছাড়া, যে কোন খাবারের সাথে দৈনিক ১ চা চামুচ কালিজিরার তেল বিশেষভাবে উপকারী।
৫. গরম ছ্যাঁক ব্যবহার করা বেশ ফলদায়ক।

রক্তের চর্বি নিয়ন্ত্রণ

ডায়াবেটিস হলে রক্তের চর্বি বা লিপিডের মাত্রা বেড়ে যায়। ভালো কোলেস্টেরল বা এইচ.ডি.এলের পরিমাণ কমে যায়, আর খারাপ কোলেস্টেরল বা এল.ডি.এলের মাত্রা বেড়ে যায়। রক্তে ট্রাইগ্লিসারাই- ডের মাত্রাও বেড়ে যায়। একে বলে ডায়াবেটিক ডিসলিপিডেমিয়া বা ডায়াবেটিসের জন্য রক্তের লিপিডের টালমাটাল অবস্থা। এতে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। ডায়াাবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে রক্তের লিপিডের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

রক্তে এলডিএলের মাত্রা বেশি থাকলে তা রক্তনালির দেয়ালে জমা হয়। রক্তনালির ভেতরটা সরু হযে যায়। এর ভেতর দিয়ে রক্ত সরবরাহ বিঘিœত হয়। হৃৎপিন্ডের পেশি প্রয়োজনের তুলনায় কম রক্ত পায়। এতে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। মস্তিস্কের ক্ষেত্রে হলে

স্ট্রোকের আশঙ্কা বেড়ে যায়। সুস্থতার জন্য রক্তে এলডিএলের মাত্রা কমানো প্রয়োজন। প্রতি ১০০ মিলি- লিটার রক্তে এলডিএলের মাত্রা ১০০ মিলিগ্রামের কম হওয়া উচিত। ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে ৭০ মিলিগ্রামের কম থাকলেই ভাল। রক্তে এলডিএলের মাত্রা কম রাখতে পারলে হূদেরাগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি ২০ থেকে ৫০ শতাংশ কমে যায়।

এইচডিএলের মাত্রা- প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে এইচডিএলের মাত্রা ৪০ মিলিগ্রামের বেশি আর নারীদের ক্ষেত্রে ৫০ মিলিগ্রামের বেশি থাকা প্রয়োজন। যত বেশি থাকে, তত বেশি ভালো। ৬০ মিলিগ্রামের বেশি থাকলে তা হূদেরাগ প্রতিরোধে কার্যকর বলে বিবেচনা করা হয়।

ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা- ডায়াবেটিসে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রাও বেড়ে যায়। এটি রক্তনালির দেয়ালে জমা হয়। ফলে রক্তনালির ভেতরটা সরু ও শক্ত হয়ে যায়। হূদেরাগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায় । রক্তের ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমাতে হবে। প্রতি ১০০ মিলিলিটারে মাত্রা ১৫০ মিলিগ্রামের কম থাকলে হৃদরাগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমবে।

শৃঙ্খলা: নিয়মিত ব্যায়াম, পরিমিত ও সময় মতো উপযুক্ত খাবার আর ওষুধের প্রয়োজন । শাকসবজি ও ফলমূল বেশি করে খেতে হবে। আঁশসমৃদ্ধ খাবারদাবারও বেশি খাওয়া উচিত। রিফাইন্ড শর্করা কম, অরিফাইন্ড শর্করা পরিমাণমত খেতে হবে।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. জাম বীজচুর্ণ- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।
২. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
৩. প্রেসার কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।
৪. তাছাড়া, যে কোন খাবারের সাথে দৈনিক ১ চা চামুচ কালিজিরার তেল বিশেষভাবে উপকারী।

মোটা মানুষ চিকন হওয়া

১. ফ্যাট কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
২. দেড় কাপ টক দই ও ১ চামুচ কালিজিরা রাতে খালি পেটে।
৩. ফাইটল- ৪ ফোঁটা করে দিনে ২ বার।

অজানা কারণে মুখ বেঁকে যাওয়া

মানুষের শরীরে অনেক নার্ভ বা স্নায়ু আছে। এর মধ্যে সপ্তম ক্রেনিয়াল নার্ভের নাম ফেসিয়াল নার্ভ, যা মস্তিস্ক থেকে তৈরি হয়ে, হাড়ের ভেতরে টানেলাকৃতি জায়গা পেরিয়ে কানের পেছন দিয়ে এসে মুখমন্ডলে পাঁচটি শাখার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই নার্ভের মাধ্যমেই মুখমন্ডলের মাংসপেশি নড়াচড়ার মাধ্যমে সুন্দর হাসি বা বেদনার অভিব্যক্তি তৈরি করে। যদি কোনো কারণে প্রদাহের ফলে নার্ভটি ফুলে যায়, তখন টানেলের ভেতরে থাকা অংশ খুব চাপের মধ্যে পড়ে দুর্ব্বল বা অকার্যকর হলে এ রোগ দেখা দেয়।

রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ হিসেবে গা ম্যাজ ম্যাজ করা, খাবারে স্বাদ না পাওয়া, বমি বমি ভাব বা ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে। যে দিকের নার্ভ কাজ করে না, সেদিকের মুখ ও কপালের মাংসপেশি দুর্ব্বল হয়ে যায়, চোখ বন্ধ হয় না এবং যেদিকে আক্রান্ত হয়, মুখমন্ডল তার বিপরীতে বেঁকে যায়।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. ফেসিয়াল নার্ভ কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।
২. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
৩. প্রেসার কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।

কবজি ব্যথার সমাধান

হাতের কবজিতে ব্যথা। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীতে ব্যথাটা বেশি অনুভূত হয়। কখনো কখনো বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশ ঘেঁষে খানিকটা ওপরের দিকেও ব্যথা হয়। পাশাপাশি রাতে হাত অবশ হয়ে আসে। অনেক সময় অস্থির অনুভূতির কারণে রাতে ঘুম ভেঙে যায়। বৃদ্ধাঙ্গুল কিছুটা দুর্ব্বল হয়ে গেছে। এ রোগের নাম কারপাল টানেল সিনড্রোম।

হাইপোথাইরয়েডিজম, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, গাউট, নিয়মিত মদ্যপান, ওজন বাড়া, গর্ভধারণ করা প্রভৃতি কারণের জন্য এই কারপাল টানেল ছোট হয়ে যায়। আবার কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াও হতে পারে। মধ্যর্বতী বয়সের মহিলারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন। কবজির হাড় ভেঙে সঠিকভাবে জোড়া না লাগলে বা

দীর্ঘদিন প্লাস্টার করে রাখার ফলে কারপাল টানেলে চাপ পড়তে পারে।

নার্ভ কনডাকশন টেস্টের মাধ্যমে নার্ভের ভেতরের বিদ্যুৎ চলাচলের গতি ও পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ইএমজি বা ইলেকট্রোমায়োগ্রাম পরীক্ষা, যার মাধ্যমে মাংসপেশির নার্ভ সাপ্লাই সম্পর্কে বোঝা যায়। কবজি ও নার্ভের গঠন বোঝার জন্য কবজির সিটি স্ক্যান বা এমআরআই পরীক্ষা। সহায়ক পরীক্ষা হিসেবে হাতের এক্স-রে, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের পরীক্ষা ।

মৃদু ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কবজির বিশ্রাম, যার জন্য কবজির ওপরে চাপ পড়ে এমন সব ধরনের কাজকর্ম পরিহার করা উচিত। সঙ্গে ব্যথার ওষুধ এবং স্টেরয়েড ইনজেকশন কিছুটা সুফল দেয়। একটু বেশি ব্যথা হলে অনেকে সরাসরি অবশের ইনজেকশন দিয়ে থাকেন। এতে সাময়িক উপকার হলেও ইনজেকশন নার্ভের মধ্যে ঢুকে গেলে হাত আরও অবশ হয়ে যেতে পারে। এসব চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল পাওয়া না গেলে অপারেশন করা যায়।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. কারপাল কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার ।
২. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।
৩. মুছাব্বর মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।
৪. ক্যালসিয়াম ও আয়রণ- ১ গ্লাস পানিতে আধা চাচামুচ দিনে ২ বার
৫. খাবারের সাথে দৈনিক ১ চা চামুচ কালিজিরার তেল উপকারী।
৬. গরম ছ্যাঁক ব্যবহার করা বেশ ফলদায়ক।

চুল ঝরবে না আর!

পুরুষের মাথা থেকেই সাধারণত চুল ঝরে বেশি। চুল পড়া রোধে প্রথম ব্যবস্থা হিসেবে শরীরে জোগান দিতে হবে প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলো। জন্মগত কিছু ত্রুটি ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের চুল পড়ে যায় ভিটামিনের অভাবে। কী সেই ভিটামিন আর কেমন করেই বা ভিটামিনগুলো আমাদের চুল পড়া রোধে ভূমিকা রাখে? জেনে নেওয়া যাক এবার। চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সেবাম গ্রন্থি খুব গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা রাখে। আর এই গ্রন্থির সুস্থতার জন্য ভিটামিন এ খুব দরকারি। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স হলো আটটি ভিটামিনের সমষ্টি। শরীরে লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স একদিকে

যেমন মুখ্য ভূমিকা রাখে, অন্যদিকে চুলের গোড়ায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেয়। এভাবেই চুল তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেয়ে বাড়বাড়ন্ত হয়। ভিটামিন সিতে থাকে শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এই অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট চুলকে সুস্থ যেমন রাখে, তেমনি বৃদ্ধি করে চুলের সৌন্দর্য। ভিটামিন ইর আছে লোহিত রক্তকণিকায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। তার চেয়েও বড় কথা, ভিটামিন ই মাথার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব রক্তনালিকায় রক্তের প্রবাহ ঠিক রাখে আর পৌঁছে দেয় অক্সিজেন। তাই চুল পড়ার প্রবণতাও কমে যায় অনেকখানি। এ ছাড়া সুস্থ চুল আর তার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য আরও প্রয়োজন জিংক, প্রোটিন, আয়রন, কপার ও ম্যাগনেসিয়াম।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. হেয়ার কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

২. হেয়ার টনিক অয়েল- দৈনিক ২ বার মাথার চুলে মাখুন।

৩. ক্যালসিয়াম ও আয়রণ- ১ গ্লাস পানিতে আধা চাচামুচ দিনে ২ বার

৪. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

চোখের জ্বালাপোড়ায় করণীয়

কারণঃ চোখের পানি শুকিয়ে যাওয়া, চোখের অ্যালার্জি, বাতরোগ, চোখের পাপড়ির গোড়ায় প্রদাহ, চোখের অপারেশন, ঘুমের সময় চোখ বন্ধ না হওয়া, চোখের কালো মণিতে ভাইরাস সংক্রামণ, কালো ধোঁয়া, ধুলোবালি চোখে পড়লে, চোখে রাসায়নিক পড়লে। যেমন- চুন, এসিড ইত্যাদি, চোখে ওষুধের রিঅ্যাকশন হলে (স্টিভেন জনসন সিনড্রোম), চোখের ড্রপ ব্যবহারেও প্রাথমিক অবস্থায় চোখ জ্বলতে পারে।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

২. মুছাব্বর মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ রাতে শোবার আগে।

৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

মূত্রনালির সমস্যা

যেহেতু আমাদের প্রস্রাবের থলির স্বাভাবিক ধারণক্ষমতা ৩০০ সিসি, তাই স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ ২৪ ঘন্টায় পাঁচবার প্রস্রাব করে থাকে। সাধারণত দিনে চারবার আর রাতে একবার। **হার-৪৯**

তবে নানাবিধ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কারণে বারবার প্রস্রাবের প্রবণতা দেখা দিতে পারে, আবার কমেও যেতে পারে। যদি আমরা অতিরিক্ত পানি বা তরলজাতীয় খাবার খাই, তবে প্রস্রাবের পরিমাণ বেশি হয়, বারবার প্রস্রাব হয়। বারবার প্রস্রাব হয় ডায়াবেটিসেও। অন্যদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বয়সজনিত স্বাভাবিক পরি- র্বতন হিসেবেই বৃদ্ধি ঘটে প্রোস্টেট গ্রন্থির। প্রোস্টেট গ্রন্থি প্রস্রাব প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে প্রস্রাবের থলি সব সময় সর্ম্পূণ খালি হয় না। আর বৃদ্ধি পাওয়া প্রোস্টেট সৃষ্টি করে প্রস্রাবের থলির মুখে এক ধরনের অস্বস্তি। বয়োবৃদ্ধির কারণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রস্রাবের থলিরই ধারণক্ষমতা কমে যায়। বারবার প্রস্রাব করার প্রবণতা বাড়ে।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. প্রস্টেট কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

২. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

৪. তাছাড়া, যে কোন খাবারের সাথে দৈনিক ১ চা চামুচ কালিজিরার তেল বিশেষভাবে উপকারী।

উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ

উচ্চ রক্তচাপ বা অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ দীর্ঘ সময় থাকলে হৃৎপিন্ডের রক্তনালিতে চর্বির আস্তর জমে ব্লকেজ হতে পারে এবং রক্তপ্রবাহ বাধা পাওয়ার ফলে ওংপযবসরপ যবধৎঃ ফরংবধংব হতে পারে, যা হৃৎপিন্ডের একটি ভয়াবহ রোগ। হৃৎপিন্ডের দেয়াল মোটা হয়ে হাইপারটেনসিভ হার্ট ডিজিজ, হার্ট ফেইলর হতে পারে।

রক্ত চলাচলের সময় রক্তনালিতে যে চাপ দেয়, তাকেই রক্তচাপ বলে। রক্তচাপ ধমনি, শিরা তথা রক্তনালির আকারের ওপর নির্ভর করে, আর রক্তনালি সংকীর্ণতর হলে শরীরের বিভিন্ন অংশে একই পরিমাণে রক্ত সরবরাহের জন্য হৃৎপিন্ডের অপেক্ষাকৃত বেশি কাজ করতে হয়। এ রকম অবস্থায় হৃৎপিন্ডকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চাপ দিয়ে রক্ত সরবরাহ বজায় রাখতে হয়। আর এ বেশি চাপ দেওয়ার অবস্থাকেই উচ্চ রক্তচাপ বলে।

৩০ থেকে ৫০ বছর বয়সে সাধারণত উচ্চ রক্তচাপের **হার-৫০**

সমস্যা দেখা দেয়। পুরুষের উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা ও প্রকটতা নারীদের চেয়ে বেশি। গর্ভকালীন ও জন্মনিরোধক ওষুধ গ্রহণকালে নারীদের উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে। যাঁদের ওজন উচ্চতার তুলনায় বেশি, তাঁদের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার আশঙ্কাও বেশি।

উচ্চ রক্তচাপ জীবনে হুমকিস্বরূপ। এটি শরীরের গুরুত্বর্পূণ অঙ্গপ্রত্য-ঙ্গের ক্ষতি করে। যেমন- ১. স্ট্রোক (মস্তিষ্কের রক্ত- ক্ষরণ), ২. হার্ট অ্যাটাক, ৩. হার্ট ফেইলর, ৪. কিডনির ফেইলর ৫. চোখে রক্তনালির চাপ বাড়ে ও তা স্ফীত হয়ে যায়, ৬. রক্তনালির বাইরে দেয়ালে ক্ষত সৃষ্টি হয়, ৭. রক্তনালির ভেতরের দেয়ালে চর্বি জমে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত ৮. যৌনকাজে অক্ষমতা।

প্রেশার মাপার পর সহসা উচ্চ রক্তচাপের উপস্থিতি জানা যায়- ১. তীব্র মাথাব্যথা, সকালের দিকে হয়, বমি বমি ভাব, ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি কমে আসে; ২. মাথা ঝিমঝিম ভাব; ৩. ঘুম কম হওয়া; ৪. শ্বাসকষ্ট এবং ৫. নাক দিয়ে রক্ত পড়া।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আজীবন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। ওজন কমাতে হবে। অতিরিক্ত সোডিয়াম লবণ, চর্বিযুক্ত মাংস, কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাদ্য র্বজন করতে হবে। বিশ্রাম ও ঘুমের মাধ্যমে, যোগব্যায়ামের মাধ্যমে কিংবা সবকিছু সহজভাবে গ্রহণ করতে হবে। হালকা ব্যায়াম করতে হবে। নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে, ডায়াবেটিস থাকলে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ধূমপান বন্ধ করতে হবে।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. প্রেসার কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

২. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

খাবারের সাথে দৈনিক ১ চা চামুচ কালিজিরার তেল উপকারী।

শ্বেতী রোগ (ত্বকের বিভিন্ন স্থানে সাদা হওয়া)

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. শ্বেত কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

২. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

এটি দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা। শ্বেতী মলম ব্যবহারও ফলদায়ক। **হার-৫১**

ত্বকের সমস্যা – সাদা ফাটা ফাটা দাগ

কাঁধের কাছাকাছি ও কোমরে সাদা ফাটা ফাটা দাগ দেখা দিয়েছে এবং দাগগুলো অনেক জায়গাজুড়ে ছড়িয়ে গেছে। দেখতে খুব খারাপ লাগে।

সমাধান: শরীরে যে দাগগুলো হয়েছে, এটাকে ইলাসটেরিয়া ডিসনে-মিয়া বলে। সাধারণত ছেলেদের বাড়ন্ত বয়সে এটি বেশি দেখা যায়। সমস্যাটি হরমনজনিত কারণেও হয়। ত্বকে কোলাজেন কমে গেলে এ রকম হয়। এ ক্ষেত্রে টেরিটিনরেন ক্রিম ব্যবহার করলে উপকার হয়।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. ফেস কিউর- সামান্য পানি মিশিয়ে দৈনিক ২ বার মাখতে হবে।

২. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

মেরুদন্ডের শেষ হাড়ের ব্যথা

লক্ষণ: ককসিডাইনিয়া বা মেরুদন্ডের শেষ হাড়ের ব্যথা পরুষের থেকে মহিলাদের পাঁচগুণ বেশি। বসার সময় বা বসার পর ব্যথা হয়। দীর্ঘক্ষণ বসলে ব্যথা বেড়ে যায়। শক্ত জায়গায় বসা যায় না। কখনো বসা থেকে দাঁড়াতে গেলে ব্যথা হয়। কখনো নরম জায়গায় বসলেও ব্যথা হয়। পেছনে হেলান দিয়ে বসলে বেশি ব্যথা হয় কিন্তু সামনে ঝুঁকে বসলে ব্যথা কম হয়। গভীর ব্যথা হয় ককসিসের আশপাশে। রিকশায় বসলে হাতে ভর দিয়ে কোমর আলগা করে রাখতে হয়। মলত্যাগ করার সময় ব্যথা হয়। সহবাসের সময়ও ব্যথা হয়।

প্রতিকার: চিকিৎসা নির্ভর করে এর কারণগুলোর ওপর। সাধারণ পরীক্ষা, এক্স-রে বসা ও দাঁড়ানো অবস্থায় এবং কখনো কিছু সোফিসটি-কেটেড পরীক্ষার প্রয়োজন হয় ককসিডাইনিয়ার সঠিক কারণ জানার জন্য। পরীক্ষাগুলোর মধ্যে আছে সিটি স্ক্যান ও এমআরআই।

চিকিৎসা: উপযুক্ত স্ট্রেসিং ও পেশি শক্তিশালী হওয়ার ব্যায়াম করতে হবে। রিপিটেটিভ স্ট্রেইন যেমন দীর্ঘক্ষণ মোটর বা সাইকেল চালানো যাবে না। শক্ত জায়গায় বসা নিষেধ। নরম জায়গায় বসতে হবে। বসার জন্য ককসিস কুশন ব্যবহার। গরম সেক দেওয়া। বেদনা নাশক ওষুধ সেবন। স্টেরয়েড ও লোকাল অ্যানেসথেটিক এজেন্ট ইনজেকশন নেওয়া যেতে পারে। **হার-৫২**

অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ থেরাপি। ককসিস সার্জারি: দীর্ঘদিন ব্যায়াম, মেডিকেল চিকিৎসা এবং স্টেরয়েড ও লোকাল অ্যানেসথেটিক এজেন্ট ইনজেকশন দেওয়া সত্ত্বেও যদি ককসিডাইনিয়া বা মেরুদন্ডের শেষ হাড়ের ব্যথা না কমে সে ক্ষেত্রে ককসিস সার্জারি করাতে হবে।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. ক্যালসিয়াম- ১ গ্লাস পানিতে আধা চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

২. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে

৩. নিম-চিরতা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে।

মাসিকের ব্যথা কমাতে

তল পেটে এবং পিঠের নিচের অংশে গরম পানি ভর্তি হট ওয়াটার ব্যাগ ব্যবহার, কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করলে ব্যথা কমে। প্রচুর ভিটামিন বি, ই, সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। আঁশ সমৃদ্ধ খাবার, প্রচুর ফল ও সবজি খেতে হবে। কারণ এই খাবারগুলোতে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ উপাদান এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। ঘৃতকুমারী রসের বা অ্যালোভেরা শরবত ও পেঁপে খেলেও ব্যথা কমে।

অতিরিক্ত দুগ্ধজাত খাবার, মাংস এবং শুঁটিজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। অতিরিক্ত চা ও কফি, অর্থাৎ ক্যাফেইন এড়িয়ে চলতে হবে। এ সময় ধূমপান ও অ্যালকোহল গ্রহণ এড়িয়ে চলতে হবে।

হালকা ব্যায়াম এ সময় ব্যথা উপশমে বেশ কার্যকর। তাছাড়া যে কোনো এসেনশিয়াল তেল দিয়ে হালকা মালিশেও ব্যথা কমে আসবে। অতিরিক্ত ব্যথা হলে ব্যথা কমানোর ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. ভিটামিন মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে আধা চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

২. আয়রণ মিশ্র- ১ গ্লাস পানিতে আধা চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

৩. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।

৪. প্রয়োজনে সাথে নো-স্পা ও ফিলমেট দেয়া যায়।

বিকল কিডনির জন্য ডায়ালাইসিস

আমাদের শরীরের কিডনির কাজ হচ্ছে:

১. আমাদের শরীরে খাবার গ্রহণের পর যেসব বর্জ্য

পদার্থ জমা হয় সেগুলোকে রক্তপ্রবাহ থেকে আলাদা করে বা ছেঁকে মূত্রথলিতে পাঠানো, ২. পরিষ্কার করার পর বিশুদ্ধ রক্তকে পুনরায় শরীরে সঞ্চালনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যঙ্গে পাঠানো, ৩. শরীরে রক্তস্বল্পতার কারণ দূর করা, ৪. শরীরে দরকারী উপাদান এসিডের ভারসাম্য রক্ষা।

কিডনি অকার্যকর হওয়ার কারণ:

১. অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ ২. অনিয়ন্ত্রিত বহুমূত্র রোগ ৩. ত্রুটি, ৪. কিছু যন্ত্রণানাশক ওষুধের অবারিত ব্যবহার, (৫) মূত্রনালির প্রদাহ সংক্রমণ।

অকার্যকরতার লক্ষণ: ১. উচ্চ রক্তচাপের অনুভূতি, যেমন মাথা ধরা, ঘাড়ব্যথা, মাথা ঘোরানো, খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি; ২. বমির ভাব ও বমনোদ্রেক; ৩. তলপেট ও কোমরে ব্যথা; ৪. মাথা ঝিমঝিম করা; ৫. সাধারণভাবে শারীরিক দুর্বলতার অনুভূতি; ৬. নিঃশ্বাস গ্রহণে অসুবিধা; ৭. পায়ে ও মুখে পানি জমা হয়ে ফুলে যাওয়া; ৮. ঘন প্রস্রাবের বেগ।

চিকিৎসা:কিডনি বিশেষজ্ঞ বা নেফ্রোলজিস্টের পরামর্শ নিতে হবে। রক্তচাপ ও বহুমূত্র রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সুষম খাদ্যাভ্যাস করতে হবে। বিশেষ করে আমিষযুক্ত ও তৈলাক্ত খাবার কম খেতে হবে।

কিডনির কার্যকরতা পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন সময় রক্ত ও প্রস্রাব অন্তত: বছরে একবার নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।

চিকিৎসা পদ্ধতি: কিডনির কার্যকরতা বিনষ্ট বা বিঘ্নিত হলে ডায়া-লাইসিস করতেই হবে। ডায়ালাইসিস হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত বিশুদ্ধ করা। ডায়ালাইসিস করা একবার শুরু হলে জীবনভর চালু রাখতে হবে। এই ডায়ালাইসিস পদ্ধতি ব্যয়বহুল।

ডায়ালাইসিস পর্যায়ের আগেই সর্তকতা অবলম্বন -

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. কিডনী কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

২. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।

৩. যে কোন খাবারের সাথে দৈনিক ১ চা চামুচ কালিজিরার তেল বিশেষভাবে উপকারী।

তাছাড়া, ডায়াবেটিক থাকলে তাকে জামবীজ চুর্ণ ও নিম চিরতা, উচ্চ রক্তচাপ থাকলে প্রেসার কিউর খেতে হবে।

হার্টের অ্যাটাক সমস্যা

হার্ট অ্যাটাক কেন হয়: হৃৎপিন্ড বা হার্ট বুকের মাঝখানে ও বাঁ পাশের কিছু অংশজুড়ে থাকে। সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালনের কাজ করে থাকে। হার্ট একমাত্র অঙ্গ, যা সারাক্ষণ কাজ করে, কখনোই বিশ্রাম নেয় না।

হার্টের রক্তনালির কাজ: সারাক্ষণ হার্টের কাজ করার জন্য প্রয়োজন হয় অক্সিজেন ও পুষ্টি। এই অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহের জন্য রয়েছে হার্টের নিজস্ব রক্তনালি। মূলত তিনটি রক্তনালি তাদের শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে রক্ত সরবরাহ করে থাকে হার্টের মাংসপেশিতে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু এই তিনটি রক্তনালি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণেই হয়।

হার্ট অ্যাটাক কিভাবে হয়: তিনটি রক্তনালির যেকোনো একটি যদি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক হয়। রক্তনালি যদি আ েতআ েত অনেক দিন ধরে বন্ধ হয়, তাহলে হার্ট অ্যাটাক নাও হতে পারে, কিন্তু হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে অবশ্যই হার্ট অ্যাটাক হবে।

অনেকের শরীরে বিভিন্ন রক্তনালিতে চর্বি জমে এবং রক্তনালি সরু হতে থাকে। ফলে বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ কমতে থাকে। হঠাৎ করে রক্তনালি বন্ধ হয়ে যাবে কি না, তা নির্ভর করে রক্তনালির মধ্যে জমে থাকা চর্বির ভেতরের দিকের যে আবরণ থাকে, তার ধরনের ওপর। ভেতরের দিকের আবরণ ফেটে গেলে সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তনালির সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়। ফলে হার্টের মাংসপেশি নষ্ট হতে থাকে এবং এটাকেই হার্ট অ্যাটাক বলা হয়। তবে আট ঘন্টার মধ্যে যদি রক্তনালি খুলে দেওয়া যায়, তাহলে হার্টের মাংসপেশিকে রক্ষা করা সম্ভব। গবেষণায় বিভিন্ন ফ্যাক্টরকে রক্তনালির ওপরের আবরণ ফেটে যাওয়ার জন্য দায়ী করা হয়ে থাকে, যেমন-

অতিরিক্ত পরিশ্রম করা, যে পরিশ্রমে শরীর অভ্য ত নয়। অতিরিক্ত খাওয়া ও খাওয়ার পরপর শারীরিক পরিশ্রম করা। একসঙ্গে অতিরিক্ত ধূমপান করা। নিদ্রাহীনতা। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করা। হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া বা রেগে যাওয়া। শরীরে যেকোনো ধরনের ইনফেকশন।

হার্ট অ্যাটাকের উপর্সগ কি: সাধারণত বুকের মাঝখানে ব্যথা হয়। কখনো কখনো বুক চেপে আসা, বুক ভারী লাগা,

বুক জ্বলে যাওয়া এ রকম উপর্সগ হতে পারে। বসা, শোয়া অবস্থায়ও ব্যথা হয়, ব্যথাটা বাঁ হাতে, গলায়, পেছনে ছড়িয়ে যেতে পারে। ব্যথার সঙ্গে ঘাম, বমি হওয়া ও শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে পারে।

হার্ট অ্যাটাক কিভাবে এড়িয়ে চলা যায়?

যেসব কারণে রক্তনালির আবরণ ফেটে যায়, সেগুলোকে এড়িয়ে চলা। নিয়মিত হাঁটা। হাঁটলে হার্টে নতুন নতুন রক্তনালি তৈরি হয়। যাঁদের বয়স ৪০ বছর পার হয়ে গেছে এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি, তাঁরা নিয়মিত অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খেতে থাকলে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা কমে যায়। কোলস্টেরল কমানোর ওষুধগুলো রক্তে কোলস্টেরলের মাত্রা কমানো ছাড়াও রক্তনালির ওপর জমে থাকা চর্বির আবরণ শক্ত করে এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়।

হারবাল চিকিৎসাঃ

১. হার্ট কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।

২. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।

৩. খাবারের সাথে দৈনিক ১ চা চামুচ কালিজিরার তেল উপকারী।

তাছাড়া, ডায়াবেটিক থাকলে তাকে জামবীজ চুর্ণ ও নিম চিরতা, উচ্চ রক্তচাপ থাকলে প্রেসার কিউর খেতে হবে।

লিভারের যত অসুখ

লিভার শরীরের সর্ববৃহৎ অঙ্গ। আকৃতিতে যেমন বৃহৎ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ। শরীরকে সুখে রাখতে দরকার সুস্থ লিভার। অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত- লিভার আমাদের জীবনে বয়ে নিয়ে আসে দুঃখ, কষ্ট এমনকি অকালে প্রস্থান। অন্য যে কোন যন্ত্র বা মেশিনের মত আমাদের দেহ যন্ত্রও চলে শক্তির সাহায্যে। এ শক্তি আসে খাদ্য থেকে। আমরা যেরূপে খাবার খাই তা থেকে সরাসরি শক্তি উৎপন্ন হতে পারে না। জটিল খাবার লিভারে প্রক্রিয়াজাত হয়ে শক্তি উৎপাদনের উপযোগী হয়ে জমা থাকে এবং প্রয়োজন মাফিক শরীরের কোষে কোষে পৌছে শক্তি উৎপাদন করে। তাই লিভারকে বলা হয় শরীরের পাওয়ার হাউজ। শরীরে উৎপন্ন বিভিন্ন দুষিত পদার্থ লিভার বিশুদ্ধ করে এবং পরবর্তীতে শরীর থেকে বের করার ব্যবস্থা করে। শরীরে কোন বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করলে লিভার সেটিকে বিষমক্ত করে।

প্রোটিন জাতীয় পদার্থ তৈরী করে যা শরীরের জন্য অপরিহার্য।
লিভারের রোগ: হেপাটাইটিস বা লিভারে প্রদাহ বিশ্ব জুড়ে লিভারের প্রধান রোগ যার কারণ এ,বি,সি,ডি,ই, হেপাটাইটিস ভাইরাস। পানি ও খাবারের মাধ্যমে সংক্রমিত হেপাটাইটিস এ ও ই ভাইরাস লিভারে একিউট হেপাটাইটিস বা স্বল্প স্থায়ী প্রদাহ সৃষ্টি করে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেরে যায়। দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের জন্য দায়ী হেপাটাইটিস বি,সি ও ডি ভাইরাস। ভাইরাস ছাড়াও অতিরিক্ত এলকোহল, লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমা, বিভিন্ন ড্রাগ ও কেমিক্যালস হেপাটাইটিস করে। অটোইমিউন হেপাটাইটিস, উইলসন্স ডিজিজ সহ বিভিন্ন অজানা কারণ জনিত রোগ ও বংশগত রোগে লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক হেপাটাইটিস চলতে থাকলে লিভারের কোষগুলো মরে যায়। অকার্যকর ও অপ্রয়ো- জনীয় ফাইব্রাস টিসু সেস্থান দখল করে জন্ম দেয় সিরোসিস নামক মারাত্মক রোগ। সিরোসিস হলে লিভারের কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। হেপাটাইটিস বি এবং সি সংক্রমন, ফ্যাটি লিভার, অতিরিক্ত মদ লিভার সিরোসিসের প্রধান কারন। ডায়াবেটিস, রক্তের চর্বির উচ্চমাত্রা প্রভৃতি কারণে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মত লিভারেও ফ্যাট জমে ফ্যাটি লিভার হয়।

এছাড়া ব্যাকটেরিয়া এবং প্যারাসাইট লিভারে এ্যাবসেস বা ফোঁড়া তৈরী করতে পারে। সর্ব্বোপুরি প্রাণঘাতি ক্যান্সার ও ভর করতে পারে লিভারে। সিরোসিস থেকে ক্যান্সার হওয়ার প্রবনতা সবচেয়ে বেশি।

হেপাটাইটিস ভাইরাস কিভাবে ছড়ায়:
দুষিত খাবার ও পানির মাধ্যমে হেপাটাইটিস এ ও ই ছড়ায়। বড়দের জন্ডিস এর প্রধান কারণ হেপাটাইটিস ই ভাইরাস।

রক্ত ও ব্যক্তিগত অনৈতিক আচরনের মাধ্যমে ছড়ায় হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস। দুষিত রক্ত গ্রহণ বা দুষিত সিরিজ , একই শেভিং রেজার ব্যবহারের মাধ্যমে, আক্রান্ত মার্তৃগর্ভ থেকে ছড়াতে পারে। তবে মায়ের দুধের মাধ্যমে বি ভাইরাস ছড়ায় না।

কিভাবে বুঝবেন আপনার হেপাটাইটিস হয়েছে কি না?
একিউট হেপাটাইটিসে ক্ষুধামন্দা, শরীর ব্যাথা, বমির ভাব কিংবা বমি এবং কিছু দিনের মধ্যে প্রস্রাবের রং ও চোখ হলুদ বর্ন ধারন করে। এ সময় শরীরে চুলকানী দেখা দিতে পারে।

জন্ডিস ক্রমে বেড়ে যেয়ে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কেউ কেউ দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা বা ক্ষুধামন্দা অনুভব করতে পারে। হেপাটাইটিস বি ও সি অনেকাংশই নিরাময় যোগ্য। এসব রোগিদের পেটে পানি জমে পেট ফুলে যেতে পারে, রক্ত বমি বা কাল পায়খানা কিংবা অজ্ঞান হতে পারে। শরীর জীর্ন শির্ন হয়ে যায়।

লিভারের রোগ হলে কি করবেন:
লিভারের রোগীর কোন উপসর্গ বা ভাইরাসের সংক্রমন নিশ্চিত হলে লিভার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন (যেমন- প্রফেঃ মুবীন খান)। হেপাটাই- টিস এ ও ই জনিত রোগ ভাল হয়। জন্ডিস কে কখনও অবহেলা করবেন না। ক্রনিক হেপাটাইটিসের জন্য দায়ী হেপাটাইটিস বি ও সি এর ঔষধ গুলি দেশে পাওয়া যায়। তাই এ ক্ষেত্রেও হতাশ হবেন না।

লিভার রোগ প্রতিরোধে আপনার করণীয়:
০ হেপাটাইটিস বি এর টীকা নিন ০ ঝুঁকিপূর্ণ আচারণ যেমন-অনিরাপদ যৌনতা, একই সুঁই বা সিরিন্জ বহুজনের ব্যবহার পরিহার করুন। ০ নিরাপদ রক্ত পরিসঙ্গালন ও ডিজপজেবল সুঁই ব্যবহার করুন। ব্লেড, রেজার, ব্রাশ; খুর বহু জনে ব্যবহার বন্ধ করুন। ০ শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রন করুন। ০ শাক সবজি ও ফলমূল বেশি করে খান আর চর্বি যুক্ত খাবার কম খান। ০ মদ্যপান ও অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্য পরিহার করুন। করুন। ০ বিশুদ্ধ পানি ও খাবার গ্রহন করুন। ০ ডায়াবেটিস ও হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রনে রাখুন। ০ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন।

শেষ কথা : মানুষের দেহে লিভার মাত্র একটিই এবং জীবন ধারনের জন্য এটি অপরিহার্য। তাই লিভারের সুস্থতার জন্য সচেষ্ট থাকুন।

হারবাল চিকিৎসাঃ
১. লিভার কিউর- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ দৈনিক ২ বার।
২. ত্রিফলা- ১ গ্লাস পানিতে ১ চা চামুচ সকালে খালি পেটে, ও রাতে খাবারের ১ ঘন্টা আগে।
৩. যে কোন খাবারের সাথে দৈনিক ১ চা চামুচ কালিজিরার তেল বিশেষভাবে উপকারী।

তাছাড়া, ডায়াবেটিক থাকলে তাকে জামবীজ চুর্ণ ও নিম চিরতা, রক্তচাপ থাকলে প্রেসার কিউর দিতে হবে।।

প্রাথমিক চিকিৎসা

আগুনে পোড়া
পোড়া স্থানে বরফ দিতে হবে। তারপর চুণের পানি ও সমপরিমান নারিকেল তেল ভালভাবে মিশিয়ে ব্যবহার্য্য। গ্লিসারিনও দেয়া যাবে।

পেটে কাঁকড় বা কাঁচ গেলে
১ গ্লাস পানিতে ৩ চামুচ ইসুবগুলের ভুষি ও মিশ্রি মিশিয়ে খাবে।

পেটে চুল গেলে
গোল মরিচ গুড়া ও সৌন্ধব লবন দিয়ে পাকা আনারস খাবে।

কাটা যায়গা দিয়ে অবিরত রক্ত ঝরলে
খাঁটি তারপিন তেল কাঠিতে জড়ানো তুলা দিয়ে লাগাতে হবে।

বমি প্রবণতা
হাতের কবজির গোড়ার মুল বড় নার্ভটিকে কিছুক্ষণ জোরে চেপে ধরে রাখলে বমিভাব কমে যাবে। বমি ও গ্যস্ট্রিকের ওষুধ দিতে হবে।

দুর্ঘটনায় আহত হলে
রক্তপাত হলে প্রথমে এন্টিসেপ্টিক দিয়ে স্থানটি ধুয়ে ফেলুন। পরিস্কার কাপড় বা কটনপ্যাড দিয়ে স্থানটি বাধুন। এ.টি.এস জাতীয় ইনজেকশন বাহুর মাসেলে প্রয়োগ করুন। ব্যথা ও ক্ষত শুকানোর ঔষধ দিন। মচকে গেলে হালকাভাবে টানুন এবং রিপ্লেসের চেস্টা করুন। হাড় ভেঙ্গে গেলে উপযুক্ত সাপোর্ট ব্যবহার করুন। দ্রুত হাসপাতালে নিন।

পানিতে ডুবে গেলে
পানি থেকে তুলে বুকে ও পেটে হালকা চাপ দিয়ে পানি বের করুন। প্রয়োজনে মুখের সাথে আপনার মুখ লাগিয়ে ভ্যাকিউম করে পানি বের করুন। রোদে বা গরম স্থানে রাখুন। হাতে পায়ে গরম সরিষার তেল মালিশ করুন। বেশী খারাপ অবস্থা হলে হাসপাতালে নিন।

ইঁদুর কামড়ালে
আক্রান্ত স্থানটি টিপে কিছুটা রক্ত বের করে নিন। এন্টিসেপ্টিক ও সাবান- পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। পুঁদিনা পাতার রস দিন। ভ্যাকসিন বা টিকা দিন।

কুকুর, বিড়াল, বেজী, গুইসাপ কামড়ালে
টিপে রক্ত বের করে দিন। আধাঘন্ট ধরে সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ব্যথার ঔষধ ও প্রতিষেধক ইনজেকশন দিন।

মৌমাছি কামড়ালে
চিমটা দিয়ে হুলটি তুলে ফেলুন যেন হুলের গোড়ায় চাপ না লাগে। কেরোসিন ও লবন মিশিয়ে ধুয়ে ফেলুন। পিয়াজের রস ও মধু মিশিয়ে প্রলেপ দিন। প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ দিন।

জোঁকে কামড়ালে
জোঁকের উপর সামান্য আটা মেখে, তাতে সরিষার তেল অথবা মুলা পাতার রস ঢেলে দিলে জোঁক কামড় ছেড়ে দিবে। নিমপাতা বা নিমচিরতা সামান্য পানি দিয়ে গুলে আক্রান্ত স্থানে পট্টি দিবেন।

সাপের কামড়
বিষধর সাপের কামড়ে বাংলা ঃ এর মত চিহ্ন হয়। এর ৩ ইঞ্চি শক্ত করে রশি বা কাপড় দিয়ে বাঁধবেন। তার উপরে ৩ ইঞ্চি পর পর আরও ২ টি বাঁধ দিবেন। আক্রান্ত স্থানটি পরিস্কার স্টিলের চাকু বা নতুন ব্লেড দিয়ে + চিহ্নের মত করে চিঁড়ে ফেলবেন। আক্রান্ত রক্ত যে কোন উপায়ে শুঁষে বের করে নিবেন। একটি চুণের বড় চাকা ধরে আরও রক্ত শোষণ করবেন। সামান্য পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গাণেট গুঁড়া করে আক্রান্ত স্থানে লেপে দিবেন। রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে পাঠাবেন।

ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় যে কোন বিষ খেয়ে ফেললে
১০০ গ্রাম খাঁটি ঘি এর সাথে ২০-২৫ টা গোলমরিচের গুড়া ভালভাবে মিশিয়ে রোগীকে খেতে দিবেন। পরে এক গ্লাস হালকা গরম দুধ খাওয়াবেন। রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে পাঠাবেন।

শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় টিকা

1. BCG (TB)	শিশু জন্মের পরপরই
2. DPT (diptheria)	৬, ১০ ও ১৪ তম সপ্তাহে মোট ৩ টি ডোজ
3. OPVL (polio)	৬, ১০, ১৪ তম সপ্তাহে ও নবম মাসে।
4. Hepatitis -A	যে কোন বয়সে
5. Hepatitis -B	জন্মের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অথবা যে কোন বয়সে
6. Measles	নবম মাসে
7. MMR	পনের তম মাসে

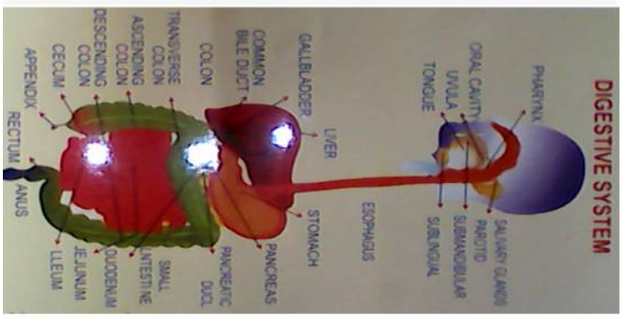

- মৌমাছি পালন প্রশিক্ষণ
- মৌ-সরঞ্জাম তৈরী ও বিক্রয়
- সেবামূলক দামে খাঁটি মধু
- ফ্রি রোগী দেখা (হারবাল)
- গাইনী চিকিৎসার ব্যবস্থা
- সেবামূলক দামে হারবাল ঔষধ
- মেশিনারী / গৃহস্থালী দ্রব্য তৈরী
- সকল সামগ্রীর সেবামূলক দাম

র্যাফকো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
মোবাইল ঃ 01911359077
ই-মেইল ঃ rafcopnd@gmail.com
ওয়েব ঃ www.rafcopnd.wix.com/rafco

- ড. মোঃ রফিক মিয়া

হারবাল চিকিৎসার প্রশিক্ষণ

(চিকিৎসা পদ্ধতি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা)

খাদ্য ও পুষ্টি
মানব দেহের পরিচয়
রোগ নির্ণয়
চিকিৎসা পদ্ধতি
প্রাথমিক চিকিৎসা

- ড. মোঃ রফিক মিয়া

র্যাফকো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
মোবাইল ঃ 01911359077
ই-মেইল ঃ rafcopnd@gmail.com
ওয়েব ঃ www.rafcopnd.wix.com/rafco